বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তাঁহার মত নির্ভীক ও তেজস্বী লোক প্রায় দেখা যায় না। তাঁহাকে অপমান করিয়া কিংবা অসম্মান দেখাইয়া কেহই রেহাই পাইত না। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কার্য্যের জন্য হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত দেখা করিতে যান। তখন কার সাহেব টেবিলের উপর পা তুলিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তাঁহার ঘরে আসিলেন তখন সাহেব তাঁহাকে বসিতেও বলিলেন না, কিংবা পাও নামাইলেন না। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। নিজের কার্য্য সারিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কার সাহবকে কোন কার্য্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইতে হইল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি চটিজুতাসুদ্ধ তাঁহার পা টেবিলের উপর তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। সাহেব যখন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি তাঁহাকে

নূতন পাঠ

বিদ্যাসাগর

অপরূপ রূপকথা

দ্বিতীয় বই

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রকাশক
শ্রীরজত সেন
IND BOOK CO.
44 Hazra Road Ballygunge,
Calcutta.

প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩
মূল্য বারো আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২৫নং, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুবাদকের কথা

হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেনের তর্জমার কাজটা আমার পক্ষে যত সুখের হয়েছিলো, সহজ ততটা হয়নি। এগুলো অনুবাদের অনুবাদ, সে মুস্কিল তো আছেই। তা ছাড়া, সেই শীতের দেশের গল্পের সমস্ত রস ও সৌরভ গরমের দেশের ভাষায় অনেক সময়ই আসতে চায় না।

আমার তর্জমা যথাসম্ভব আক্ষরিক। হয়তো সেজন্যে বাঙলা ভাষা দু' এক জায়গায় বিপর্য্যস্ত হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে ক'রেই বদ্‌লাইনি। নামগুলো সব মূলেরই আছে, যেখানে বদ্‌লেছি সেখানে বদ্‌লালে এসে যায় না।

এমনি কিছু-কিছু খুচরো অদল-বদল ছাড়া ইংরিজির সঙ্গে এ-গল্প-গুলো সম্পূর্ণই মিলবে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মেলাবার কোনো চেষ্টাই করিনি, বরং না-মেলাবার চেষ্টা করেছি ; বরফে ঢাকা দেশের শীতে-কাঁপা গল্প বাঙলা পাড়াগাঁর আলো-হাওয়ায় নিয়ে ফেললে কারুরই কিছু লাভ হ'তো না। গল্পগুলিকে ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বিদেশী ব'লেই জানুক্, এই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। তাদের পরিচয় হোক্ হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেনের সঙ্গেই।

অ্যাণ্ডারসেনের সব গল্পই ভালো, সব চেয়ে ভালো যেগুলিকে মনে করি তা থেকেও বেছে-বেছে তর্জমা করতে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ গল্প কিছু-কিছু বাদ পড়েছে, তা ছাড়া তাঁর অজস্র গল্পের তুলনায় এই তিন খণ্ডের পরিমাণও সামান্য। তবু আমার বিশ্বাস এই ক'টি গল্প প'ড়ে অ্যাণ্ডারসেনের আশ্চর্য্য প্রতিভার গভীরতা ও বৈচিত্র্য দু'য়েরই পরিচয় পাওয়া যাবে।

কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৩৬

সূচীপত্র

ছোট্ট জলকন্যা

মস্ত বড় সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে—জল যেখানে অপরাজিতার মত নীল আর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, যেখানটা এতই গভীর যে হাজারটি উঁচু-চূড়া মন্দির পর-পর সাজালে তবে উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে,—সেখানে সাগর-রাজার দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই? তা নয়, মোটে তা নয়। আশ্চর্য্য সুন্দর সেখানকার গাছপালা, এত হালকা তার ডালপালা যে জল একটু কেঁপে উঠলো কি তারা নেচে উঠলো শিরশিরিয়ে—হঠাৎ দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে কত রকমের ছোট-বড় মাছ ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে-গাছে ওড়ে পাখির ঝাঁক।

জল যেখানে সব চেয়ে গভীর সেখানে সাগর-রাজার প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার একালের, উঁচু জানলাগুলো পান্না-বসানো, আর শঙ্খের কাজ করা ঢেউ খেলানো ছাদ

ঢেউয়ের দোলায়-দোলায় এই খুলছে, এই বুজছে। কী যে সুন্দর হয় দেখতে, প্রতিটি শঙ্খের বুকে ঝকমকে উজ্জ্বল একটি মুক্তো, তার যে-কোনো একটি পেলে ওপরকার দেশের যে-কোন রাজা ধন্য হ'য়ে যায়!

সাগর-রাজার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন; তাঁর বুড়ি-মা ঘরসংসার দেখেন। এই বুড়ির বুদ্ধিসুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু সাগর-সমাজে তাঁরাই যে সব চেয়ে বড় ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর লেজে কিনা বারোটা ঝিনুক বসানো, সেটাই বড় ঘরের মার্কা, অন্যদের বড় জোর ছ'টা। এ-ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। রাজার ছয় মেয়ে, ছ'টি ফুটফুটে ছোট্ট রাজকন্যা: বুড়ি তাঁর নাত্‌নিদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। সবাই সুন্দর তারা, সব চেয়ে সুন্দর একেবারে ছোট্টটি। তার গায়ের রঙ্‌ গোলাপের পাপড়ির মতো তেমন নরম, সমুদ্রের মতই নীল তার চোখ; অবিশ্যি অন্য সব জলকন্যার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা লেজ,—তা কী কোমল আর কতো উজ্জ্বল!

সমস্তদিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়-বড় ঘরে খেলা করে; সেখানে চারদিকের দেয়ালে ফোটে নানারঙের নানারকমের সুন্দর ফুল। পান্নার জানলাগুলো একটু খুলেছো কি মাছেরা সাঁৎরে এলো ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুইপাখি উ'ড়ে আসে। কিন্তু মাছেদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি; তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা ঘেঁসে খেলা

করে, খায় তাদের হাত থেকে, আদর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সামনে মস্ত বাগান ভ'রে গাছের সারি, কোনোটা আগুনের মতো লাল, কোনোটা মেঘের মতো ঘন-নীল; গাছের ফল সোনালি রঙে ঝলোমলো, জ্বলন্ত সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে; ওদের বাগান বালিতে, উজ্জ্বল নীল রঙের বালি, গন্ধক-জ্বলা আগুনের মতো নীল। সমস্তটার ওপরে অদ্ভুত সুন্দর একটা নীল রঙের ছোপ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছি, আকাশ মাথার ওপরে, আকাশ পায়ের নিচে; সমুদ্রের তলায় যে আছি তা' মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য্য তাকিয়ে থাকে যেন বেগ্‌নি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল; তার ভরা পিয়ালা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে।

বাগানের এক-এক অংশ এক-এক রাজকন্যার দখল; সেখানে তারা যার যা' খুসি করে। একজন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চেহারা ক'রে; আর একজনেরটা ঠিক জলকন্যার মতো; কিন্তু সব চেয়ে ছোট কন্যার যেটা, সেটা একেবারে সূর্য্যের মত গোল; আর সূর্য্যটা তার চোখে কিনা লাল দেখাতো— সেইজন্যে তার ফুলগুলোও সব টক্‌টকে লাল রঙের। এই মেয়েটা কিছু অদ্ভুত গোছের, ভারি চুপচাপ, একা ব'সে ব'সে কী যেন ভাবে। হয়-তো একদিন উপরে এক জাহাজ ডুবেছে তার নানারকম রঙ্‌চঙে সুন্দর জিনিষ নিয়ে মেতেছে তার বোনেরা

কিন্তু শিশু-কোলে-করা শ্বেতপাথরের একটি বালক-মূর্তি ছ
আর-কিছু এই মেয়ে চায় না। মূর্তিটি নিয়ে সে তার বাগা
রাখলো; রোপন করলো তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ
গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো, তার লম্বা ডাল নুয়ে পড়ে
মাটির ওপর—সেখানে চির-চঞ্চল বেগ্‌নি রঙের ছায়া
যেন ডালে-মূলে জড়াজড়ি।

এই জলকন্যা সব চেয়ে ভালোবাসতো মানুষদের কথা শুনতে, সমুদ্রের ওপরে যাদের দেশ। ঠানদিকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সব গল্প শুনতো সে—জাহাজের আর মানুষের আর ডাঙার প্রাণীর যতো গল্প তিনি জানতেন সব। ওখানকার ফুলে নাকি গন্ধ আছে—কী ভালো লাগতো তার এ-কথা শুনে, তাদের সমুদ্রের ফুলগুলো সব তো গন্ধহীন,—ওখানকার বনের রঙ সবুজ, আর তার ডাল-পালায় মাছ যত ছুটে-ছুটে বেড়ায় সব নানা রঙের, আর কী মিষ্টি গলায় গান করে তারা! ঠানদির মনে ছিলো অবিশ্যি পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন: নাত্‌নিরা তো আর কখনো পাখি ছাখেনি, বললে কি কিছুই বুঝতো তারা?

গল্প শেষ ক'রে ঠানদি বলতেন,—'তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়েস হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের ওপরে; পাহাড়ের ফাঁকে বসে থাকবে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে কা'কে বলে সহর, আর কা'কে বলে মানুষ।'

বছর সব চেয়ে বড়টির পনেরো বছর হ'লো। আর-
আর আহা বেচারারা মেজটি বড়টির এক বছরের

ছোট, সেজটি মেজোর ছোট এক বছরের ; এমনি ক'রে ক'রে সব চেয়ে ছোটটির কপালে আরো পাঁচ পাঁচ বছর ব'সে থাকা ! তখন আসবে সেই শুভদিন—সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের ওপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড। যা-ই হোক্ বড়টির যখন যাবার সময় হ'লো সে কথা দিলে, ফিরে এসে বোনেদের কাছে সব গল্প বলবে ; বুড়ো ঠানদি বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কত জানতে চায় তার তো অন্তই নেই।

কিন্তু ছেলেবয়েসের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সব চেয়ে ছোটটির মত আর কারুরই তেমন তীব্র নয়। সব চেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চুপচাপ একা ব'সে কী ভাবে সে ? কত রাত খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে, চারিদিকে মাছেরা ছুটাছুটি ক'রে খেলা করছে ; দেখেছে সে সূর্য্য আর চাঁদ, ম্লান তাদের আলো, উপরে কেমন দেখায় তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়, অনেকটা উজ্জ্বল। যদি হঠাৎ কালো ছায়া পড়েছে—একটা তিমি বুঝি, না কি মানুষে বোঝাই একটা জাহাজ ভেসে চলে গেলো ! সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক অনেক নিচে ছোট এক জলকন্যা জাহাজের হালের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে।

তারপর সেই দিন এলো। বড় মেয়েটির [illegible] হ'লো পনেরো, উঠলো সে সমুদ্রের ওপরে।

ওঃ, ফিরে এসে তার হাজার গল্প! সব চেয়ে ভা[illegible] লেগেছে তার চাঁদের আলোয় বালির ওপর ব'সে মস্ত সহরট দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মত ঝিলিমিলি ক[illegible] আলো আর কতো গান-বাজ্না। দূর থেকে সে শুনে[illegible] মানুষের আর গাড়ির শব্দ, দেখেছে মন্দিরের উঁচু চূড়[illegible] শুনেছে ঘণ্টার শব্দ; আর ওখানে যেতে পারবে না ব'লেই ও-সব জিনিসের জন্যে তার আরো বেশি মন-কেমন করছে।

এ-সব গল্প শুনতে-শুনতে ছোটটির নিঃশ্বাস পড়ে না। এর পর রাত্রে তার খোলা জানলায় যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শব্দময় সহরের কথা ভাবতে-ভাবতে এমন তন্ময় হ'য়ে যায় যে তার মনে হয় সে বুঝি মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পরের বছর দ্বিতীয় বোনটি পেলো ছাড়া। সে যখন ভেসে উঠলো সমুদ্রের ওপর, সূর্য্য তখন অস্ত যায়, যায়; আর তা' দেখে এত ভালো লাগলো তার যে সে ফি'রে এসে বললে, জলের ওপরে যা কিছু তার চোখে পড়েছে, এত সুন্দর আর কিছুই নয়।

'সমস্ত আকাশ একেবারে সোনায় সোনা', সে ফি'রে এসে বললে। '[illegible]রি মেঘগুলো কী যে সুন্দর তা আমি ব'লে দেখাতে পারবো না—এই লাল, এই বেগ্নি, এই কাজল-কালো, ভেসে মিলিয়ে [illegible]লো আমার মাথার ওপর দিয়ে। কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি উড়ে এলো জলের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক সাদা

রাজহাঁস, ঠিক যেখানে সূর্য্য নেমে এসেছে। আমি তাকিয়ে রইলুম তাদের দিকে, সূর্য্য অস্ত গেলো ; সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আর মেঘের ধারে-ধারে যে-গোলাপি আভা, তা'-ও গেলো আস্তে-আস্তে মিলিয়ে।'

তৃতীয় বোনের ওপরে যাবার সময় হ'লো। সব চেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চললো এক নদীর স্রোত ধ'রে ধ'রে। নদীর দু'ধারে ছোট ছোট সবুজ পাহাড় ; সেখানে গাছ পালা, সেখানে আঙুর-ক্ষেত, ফাঁকে ফাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ। সে শুনলো পাখির গান ; আর সূর্য্যের তাপে তার মুখ প্রায় পুড়ে গেলো, থেকে-থেকে তাই তাকে জলে ডুব দিয়ে নিতে হ'লো। এক জায়গায় একদল ছেলেমেয়ে লাফালাফি ক'রে স্নান করছে ; তার খুব ইচ্ছে হ'লো ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা ছু'টে পালালো বিষম ভয়ে পেয়ে, আর ছোট্ট কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো যে অগত্যা সে-ও ভয় পেয়ে ফি'রে এলো সমুদ্রে। তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর নীলায়িত পাহাড় ; আর ফুটফুটে ছেলে-মেয়েগুলোই বা কী, পাখ্না নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁৎরে বেড়ায় !

চতুর্থ বোনটির অত সাহস হ'লো না, সে খোলা সমুদ্রেই রইলো ; ফি'রে এসে বললে, অত সুন্দর আর কিচ্ছুই হ'তে পারে না। সাদা পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে [illegible],—এত দূরে যে মনে হয়েছে যেন এক ঝাঁক গাঙচিল ; [illegible] খেলা

করেছে ফূর্তিবাজ শুশুকের দল; বিরাট তিমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোয়ারা তু'লে দিয়েছে আকাশে।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হ'লো। তার

ওরা ছু'টে পালালো বিষম ভয় পেয়ে
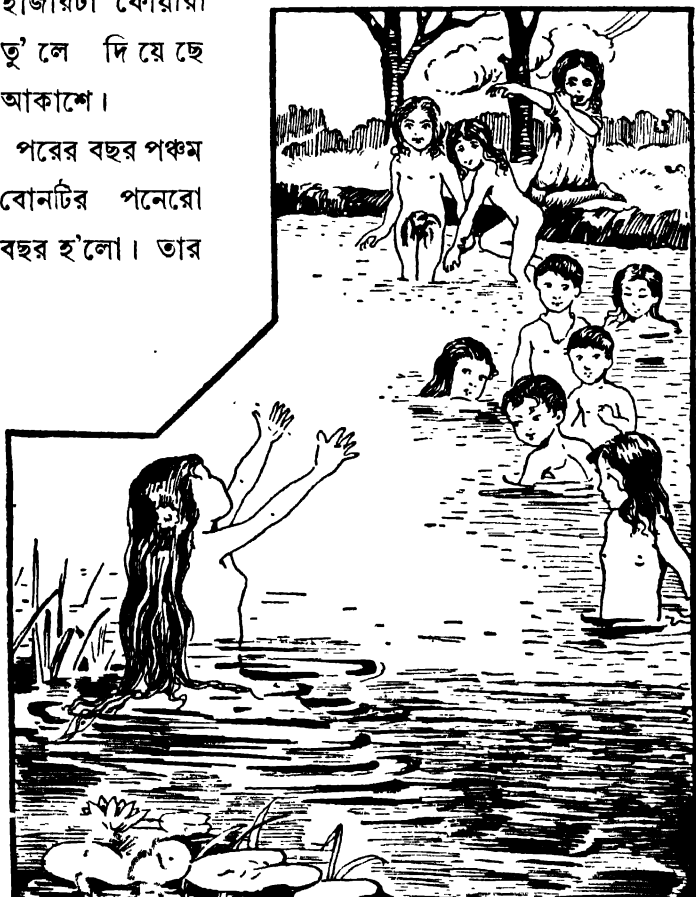
জন্মদিন পড়লো শীতকালে ; সমুদ্রের তখন সবুজ রঙ, প্রকাণ্ড সব বরফের পাহাড় জলে ভাসছে। সে বললে সেগুলো মুক্তোর মতো সাদা দেখতে—অবিশ্যি মানুষের দেশের মন্দিরগুলোর চেয়ে ঢের বেশি বড়। এরই এক পাহাড়ের চূড়োয় ব'সে সে বাতাসে তার চুল দিলে খু'লে, জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পাল তু'লে দিয়ে যত শিগগির পারলো ছুটে পালালো।

সন্ধেবেলায় সমস্তটা আকাশ পালে-পালে ভ'রে গেলো; বরফের বিরাট পাহাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালচে একটা আভায় উঠেছে ঝিকঝিকিয়ে ; আর মেঘ ছিঁড়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো, গুম্‌গুম্ ক'রে বাজের আওয়াজ চললো গড়িয়ে। তক্ষুনি নামানো হ'লো সব জাহাজের পাল, সবাই সেখানে ভয়ে জড়োসড়ো ; শুধু রাজকন্যা চুপচাপ ব'সে আকাবাঁকা বিদ্যুতের দিকে শান্তচোখে তাকিয়ে রইলো।

এরা সকলেই প্রথমবার উ'ঠে নানারকম নতুন সুন্দর জিনিস দেখে গেলো মুগ্ধ হ'য়ে, কিন্তু সে-নতুনের মোহ শিগ্‌গিরই কেটে গেলো, কিছুদিনের মধ্যেই ওপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করলো—আর কোথাও কি সব-কিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায় ?

প্রায়ই সন্ধেবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাত রেখে গভীর জল থেকে উ'ঠে আসতো। অপরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, এমন কোনো মানুষের হয় না। ঝড়ের আগে-আগে জাহাজের [illegible] দিয়ে তারা যেতো সাঁৎরে—গান গাইতো কী মধুর, কী অপরূপ মধুর

সুরে! সে-গান যেন বলতো,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা' কি দেখবে না? ওগো নাবিক, ভয় কোরো না; এসো, নিচে নেমে এসো আমাদের কাছে।

নাবিকরা অবিশ্যি সে-কথা বুঝতে পারতো না; তারা ভাবতো এ-শব্দ বুঝি শুধু জলের শিষ, এমনি ক'রে তারা সমুদ্রের লুকানো ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়ে আসতো: কেননা জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, আর মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকেনি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধেবেলায় সাঁৎরে বেড়াচ্ছে, ছোটটি ব'সে আছে তার বাপের প্রাসাদে, একা স্তব্ধ হ'য়ে মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে। কাঁদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকন্যারা তো কাঁদতে পারে না; সেইজন্যে, তাদের যখন মন খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে কত বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফে'লে সে ভাবে,—'কবে হবে আমার পনেরো বছর! আমি ঠিক জানি, ওপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের খুবই ভালো লাগবে আমার।'

শেষ পর্য্যন্ত এত আশার সেই সময় এলো।

ঠানদি বললেন,—'নে, এবার তোর পালা। আয় তোকে তোর বোনেদের মত ক'রে সাজিয়ে দিই,' ব'লে তিনি তার চুলে জড়ালেন সাদা সাপলার মালা, আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরি তার এক-একটা পাপড়ি; তারপর আটটা বড় বড় ঝিনুককে হুকুম

করলেন তার লেজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোঝা যাবে সে কতো বড় ঘরের মেয়ে।

'বড় অসুবিধে লাগে এতে', ছোট্ট রাজকন্যা আপত্তি করলে।

'সুন্দর দেখাতে হ'লে এক-আধটু অসুবিধে গায়ে না মাখলে চলে না ভাই,' ঠানদি হেসে বললেন।

এত জাঁক-জমক কিন্তু রাজকন্যার বড়ো পছন্দ হ'লো না; মাথার ভারি মুকুটটা বদ্‌লে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে সে খুসি হ'তো, তাতে তাকে মানাতোও ঢের ভালো। কিন্তু সে সাহস পেলো না; ঠানদির কাছে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের ওপর ভেসে উঠলো সে, ফেনার মতো হালকা।

যখন জলের ওপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিলে, সূর্য্য ঠিক দিগন্তে নেমে গেছে। মেঘেরা জ্বলছে লাল-সোনালি আলোয়, সন্ধ্যাতারা ফুটেছে পশ্চিমের আকাশে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, আর সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল প'ড়ে। তিনটে মাস্তুলওয়ালা এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের ওপর চুপ ক'রে শুয়ে; একটি পাল শুধু তুলে দেয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর নেই। নাবিকেরা সিঁড়িতে চুপচাপ ব'সে। ডেক থেকে আসছে গান-বাজনার শব্দ। তারপর অন্ধকার হ'লো, হঠাৎ একসঙ্গে হাজার আলো জ্বলে উঠলো জাহাজে, উড়লো অগুন্‌তি নিশেন।

ছোট্ট জলকন্যা কাপ্তেনের ঘরের কাছে গেলো সাঁৎরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে ওঠা-নামা করছে,

একবার সে উঁকি মেরে কাচের জানলা দিয়ে তাকালো। ভিতরে অনেক জমকালো পোষাক-পরা মানুষ; তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়েস তার, বড় জোর ষোলো বড়-বড় কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আ নাবিকেরা ডেকের উপর নাচছে, আর রাজপুত্র তাদের সা বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই আকাশে লাফিয়ে উঠলে, রাত হ'য়ে গেলো দিন। জলকন্যা তাতে এতই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো জলে ডু'বে।

আবার যখন সে তার ছোট মাথাটি তুললো, তার মনে হ'লো যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের ওপর ঝ'রে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ষণ সে আর কখনো সে ছাখেনি; সে কখনো শোনেও নি এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা মানুষের আছে! তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়-বড় সূর্য্য, বাতাসে সাৎরে বেড়াচ্ছে জ্বল্‌জ্বলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এত আলো যে স্পষ্ট সব দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী! সে নাবিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলো, একটু হাসি-ঠাট্টা করলো তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর সুরগুলো রাত্রির নীরবতায় গেলো মিলিয়ে।

রাত বাড়লো; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ঢেউয়ের দোলা-লাগা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইলো। নিচে জল ফেনিয়ে উঠছে, জাহাজ বুঝি ছাড়লো। ঐ তো

তু'লে দিয়েছে পাল, উঁচু হ'য়ে উঠছে ঢেউ, মোটা মোটা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো, দূর থেকে শোনা গেলো বাজের আওয়াজ।

নাবিকেরা যেই দেখতে পেলে ঝড় আসছে, অমনি তারা আবার পাল দিলে নামিয়ে। ঝড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হালকা এতটুকু নৌকোর মত দুলছিলো; ঢেউগুলো অসম্ভব উঁচু হ'য়ে উঠে জাহাজের ওপর দিয়ে গেলো গড়িয়ে—একবার সে নিচে ডুবে যায়, একবার সে মাথা তু'লে ওঠে।

এ-সব ব্যাপারে জলকন্যার অবিশ্যি খুবই মজা লাগলো, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে জড়সড়। জাহাজ গেলো ফেটে, মোটা মাস্তুলগুলো ঢেউয়ের দাপটে পড়লো নুয়ে, জোরে জল ঢুকতে লাগলো। জাহাজ একটুখানি এদিক্-ওদিক্ দুললো, তারপর বড় মাস্তুলটা বাঁশের কঞ্চির মত গেলো ভেঙে; জাহাজ উল্টিয়ে গিয়ে জলে ভ'রে উঠলো। জলকন্যা এতক্ষণে নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারলে; কেননা ভাঙা জাহাজের মোটা-মোটা কাঠ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভে'সে পাছে তার গায়েই লাগে, সেজন্যে তাকে সাবধানও হ'তে হ'লো।

কিন্তু ঠিক তখনই একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হ'য়ে এলো, চোখে আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ঙ্কর এক বিদ্যুতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেলো। জাহাজ যেই তলিয়ে গেলো জলের নিচে—তার চোখ খুঁজলো রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুসিই হ'লো: ভাবলে, এখন তো

সে আমার বাড়ীতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়লো যে জলের নিচে তো মানুষ বাঁচে না; কাজে-কাজেই রাজপুত্র যদি বা কখনো তার প্রাসাদে ঢোকে, ঢুকবে মৃত মানুষ হ'য়েই।

'না, না, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না!' নিজের বিপদের কথা ভু'লে ভাঙাচোরা টুকরোর ভিতর দিয়ে সে সাঁৎরে গেলো, শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলো রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তু'লে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজেছিলো—নিশ্চয়ই ডুবে মরতো যদি না ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জলকন্যা এসে তাকে বাঁচাতো। সে তাকে দু'হাতে জলের ওপর তু'লে ধরলো, স্রোতে ভেসে চললো দু'জনে।

সকালের দিকে ঝড় ঠাণ্ডা হ'লো, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য্য উঠলো আগুনের মতো, তার আলোয় রাজপুত্রের গালের আভা ফি'রে এলো যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকন্যা তার উঁচু কপালে চুমু খেলো, ভিজে চুল সরিয়ে দিলে মুখ থেকে। সে যেন তার বাগানের শ্বেতপাথরের মূর্ত্তির মতই দেখতে। সে আর-একবার চুমু খেয়ে মনে-মনে প্রার্থনা করলে রাজপুত্র শিগ্‌গির যেন ভালো হ'য়ে ওঠে।

তারপর সে দেখতে পেলো শুকনো ডাঙ্গা, পাহাড়গুলো বরফে চিক্‌চিক্ করছে। পাড়ের ধার দিয়ে-দিয়ে চলেছে সবুজ

তাকে জলের ওপর দু'হাতে তুলে ধ'রে ভেসে চললো দু'জনে

বন, আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি মন্দির—কী যে, ঠিক বোঝা গেলো না। ঢোকবার পথটির দু'ধারে সারি-সারি খেজুর, পাশের বাগানে লেবুগাছের ভিড়। এখানে ছোট একটি উপসাগর, জল গভীর হ'লেও খুব শান্ত, পাহাড়ের নিচে শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগলো জলকন্যা মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে তাকে শোয়ালো গরম বালুতে, সূর্য্যের দিকে ফেরালো তার মুখ।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজলো ঢঙ্ ঢঙ্ ক'রে, একদল মেয়ে বাগানে বেরিয়ে এলো বেড়াতে। জলকন্যা তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে কতগুলো পাথরের পিছনে লুকোলো, ফেণায় ঢাকলো মাথা, তাতে তার ছোট মুখটি কেউ আর দেখতেই পেলে না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখলো রাজপুত্রেরই ওপর।

একটু পরেই একজন মেয়ে এগিয়ে এলো। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেলো, সে মনে করলে ও ম'রে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছু'টে গিয়ে তার বোনেদের ডেকে আনলে। জলকন্যা দেখলে, রাজপুত্র তাজা হ'য়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের ওপর মুখ নিচু ক'রে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবিশ্যি তাকে খুঁজলো না, সে তো আর জানে না কে তাকে বাঁচিয়েছে। আর তাকে যখন মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো, এত খারাপ লাগলো জলকন্যার মন যে সে তৎক্ষণাৎ ঝুপ ক'রে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেলো তার বাপের প্রাসাদে।

ফি'রে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপ-চাপ হ'য়ে গেলো। বোনেরা জিজ্ঞেস করলে সে ওপরের পৃথিবীতে কী কী দেখে এলো, কোনো জবাব দিলে না সে।

যেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিলো সেখানে কত সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠতো। সে দেখতো পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে পেকে উঠছে ফল; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখতো না, ফিরে যেতো ম্লান মুখে সমুদ্রের তলায়। বাগানে ব'সে দেখতে রাজপুত্রের মতো সেই পাথরের মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হ'য়ে উঠলো তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্যে তার আর মমতা নেই; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উ'ঠে তারা সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেললো, তাদের লম্বা লম্বা লতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন ক'রে জড়িয়ে ফেললে যে সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হ'য়ে গেলো।

তারপর আর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারলে না। বললে গোপন কথাটা এক বোনকে, সে বললে অন্য বোনেদের, তারা বললে তাদের কোনো কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকন্যা রাজপুত্রের কথা শুনেই বুঝতে পারলে,—জাহাজের উৎসব সে দেখেছিলো নিজের চোখে; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জানা ছিলো তার।

'আর বোন', ব'লে জলকন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরলো। একসঙ্গে হাতে হাত ধ'রে তারা ভেসে উঠলো ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে।

সেই মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হ'য়ে উঠলো তার একমাত্র আনন্দ !

ঝকমকে হলদে পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপাথরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উ'ঠে গেছে। মাথায় সোনার গম্বুজ; বিরাট থামগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে শ্বেতপাথরের মূর্ত্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের মানুষ ব'লেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলোর পরিষ্কার কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় মখমলের পরদা ঝোলানো বিশাল ঘর, দেয়ালে জমকালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ফুর্ত্তির ব্যাপার; সব চেয়ে বড় একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলো মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে ছিটিয়ে ওপরের ঝকমকে গম্বুজ পর্য্যন্ত; ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো ঝিলকিয়ে প'ড়ে নাচছে জলে, চিক্‌চিক্ করছে চারদিকের সুন্দর গাছপালা।

এখন জলকন্যা জানলো কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র; এখন থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাহস ক'রে বাড়ীর যতটা কাছাকাছি সে যায়, অতটা যায় না আর কোনো বোন; শ্বেতপাথরের বারান্দার তলা দিয়ে যে-ছোট খাল গেছে, একদিন সে তা দিয়েও সাঁৎরে গেলো খানিকটা। এখানে, উজ্জ্বল জোছনার রাত্রে ব'সে ব'সে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তা'কে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেরোয় রঙ-করা সৌখিন নৌকোয়, উপরে ওড়ে নানারঙের নিশেন। জলকন্যা লুকিয়ে

এখানে জ্যোছনার রাত্রে ব'সে ব'সে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র
যখন থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে

থাকে পাড়ের সবুজ বাঁশ-বনে, কান পেতে শোনে তার কথা; তার রূপোলি ঘোমটা মাঝে-মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার খসখসানি নৌকোর কেউ যদি শোনে, মনে করে বুঝি একটা হাঁসের ডানা-ঝাপটানি কেঁপে গেলো।

কোনো-কোনো রাত্রে জেলেরা মশালের আলোয় মাছ ধরে; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কত তার মহৎ কীর্ত্তি। সে-সব কথা শুনতে শুনতে জলকন্যার মন সুখে ভ'রে ওঠে; ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সে-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিলো, আর সে শুয়েছিলো তার হাতের উপর অবশ মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, কিছুই জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সব মানুষ জলকন্যার ক্রমেই প্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগলো। আহা, সে যদি মানুষ হ'তো। কত বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজে ক'রে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাড়ানো পাহাড়ের চূড়ায় বেয়ে ওঠে; আর তাদের বন-জঙ্গল ধু-ধু কতদূর চলে গেছে, অতদূর জলকন্যার চোখ যায় না।

অনেক জিনিসের মানে সে বুঝতে চায়, কিন্তু তার বোনেরা ভালো ক'রে জবাব দিতে পারে না। যেতে হ'লো আবার তাকে বুড়ো ঠানদির কাছে—তিনি তো 'সমুদ্রের ওপরের দেশের' অনেক খবর রাখেন।

'যে-সব মানুষ ডুবে মরে না, তারা কি চিরকাল বাঁচে? আমরা যারা সমুদ্রের তলায় থাকি—আমাদের মতো তারাও কি মরে না?'

ঠানদি উত্তর দিলেন,—'মরে বই কি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোট। আমরা বাঁচি তিনশো বছর, তার পর ম'রে সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে ভেসে বেড়াই। অমর আত্মা নেই আমাদের, নেই পুনর্জ্জন্ম; একবার কেটে ফেলা ঘাসের মত আমরাও চিরকালের মতো যাই শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর ধূলো হ'য়ে গেলেও আত্মা থাকে বেঁচে; আমরা যেমন মানুষের বাড়ি-ঘর দেখবার জন্যে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে ওপর-আকাশের অজানা অপরূপ রাজ্যের দিকে, যাকে বলে তারা স্বর্গ,—আমরা তা দেখতে পারিনে।'

'আমাদের আত্মা নেই কেন?' ছোট্ট জলকন্যা জিজ্ঞেস করলে। 'আমি তো অনায়াসে তিনশো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদিনের জন্যেও মানুষ হ'য়ে বাঁচতে পাই, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ীর খোঁজ।'

ঠানদি বললেন,—'এ-সব কথা ভুলেও মনে আনিস্ নে। ঢের ভালো আছি আমরাই; কত বেশিদিন বাঁচি, কত সুখে থাকি!'

'একদিন তো মরতেই হবে; তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মত অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চূর-মার ক'রে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তু'লে শুনবো না সমুদ্রের গান, কখনো দেখবো না সুন্দর ফুলগুলো আর এই উজ্জ্বল সূর্য্য। আচ্ছা ঠানদি, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই?'

'পাগল! এ অবিশ্যি সত্যি কথা যে যদি কোনো মানুষ

তোকে এতো ভালোবাসে যে তার বাপ-মার চেয়েও তুই প্রিয় হ'য়ে উঠিস, যদি সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিবাহের মন্ত্র প'ড়ে, শপথ ক'রে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে; তা হ'লে অবিশ্যি তার আত্মা উ'ড়ে আসবে তোর মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হ'তে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সব চেয়ে সুন্দর অংশ যেটা, সেই লেজটাই তো তাদের চোখে পরম কুৎসিত, তারা ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। শরীরের সঙ্গে দুটো বিদঘুটে খুঁটি না-থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলকন্যা নিজের শরীরের দিকে তাকালো: এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু ঐ তো একটা আঁশওয়ালা লেজ!

ঠানদি বললেন, 'সুখী তো আমরাই। তিনশো বছর আমরা হেসে-খেলে, লাফিয়ে-সাঁৎরে বেড়াবো—সেটা অনেক কাল—তারপর মরবো নিশ্চিন্ত হ'য়ে। আজ রাত্রে সভায় একটা নাচ আছে যে।'

রাণী-মা যে-নাচের কথা বললেন, অমন জমকালো ব্যাপার পৃথিবীতে অবিশ্যি কখনো দেখা যায়নি। সভার দেয়ালগুলো সব স্ফটিকের, যেমন পুরু তেমনি স্বচ্ছ। তাদের গায়ে সারে-সারে হাজার-হাজার শঙ্খ বসানো, কোনোটার গোলাপি রঙ, ঘাসের মত সবুজ কোনোটা; কিন্তু সবগুলোরই ভিতর থেকে

তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোয় আলোময়। স্বচ্ছ দেয়াল ছাড়িয়ে তাদের আলো' জলেও অনেকদূর গিয়ে পড়েছে ; তা'তে ঝল্‌মল্ করে উঠছে লাখ-লাখ মাছের আঁশ—কোনোটা লাল, কোনোটা বেগ্‌নি, কোনোটা সোনালি কি রূপালি, একটা ছোট, একটা বা বড়।

সভার মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটা স্রোত, তারই উপর নাচছে দলে দলে জলপুরুষ আর জলকন্যা, তাদেরই নিজেদের অপরূপ কণ্ঠস্বরের তালে-তালে অমন মধুর নাচের ভঙ্গী পৃথিবীতে কখনো দেখা যায়নি। তারি মধ্যে ছোট্ট রাজকন্যাটির গলায় যেন সুরের ফোয়ারা, তেমন তো আর-কারো নয়। হাত-তালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে সবাই।

এতে সে খুসিই হ'লো। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনখানেই নেই, এ সে ভালো ক'রেই জানে। একটু পরেই সে উপরকার পৃথিবীর কথাই ভাবতে লাগলো ; সুন্দর রাজপুত্রকে ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই এ-দুঃখ সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এলো সে ; ভিতরে যখন বয়ে চলেছে উৎসবের স্রোত, তার ছোট্ট উপেক্ষিত বাগানে গিয়ে ব'সে রইলো সে চুপ ক'রে।

হঠাৎ সে শুনলে শিঙার ফুঁয়ের শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দূর দূরান্তরে মিলিয়ে গেলো। মনে-মনে বললে সে, 'এই বুঝি সে বেরুলো শিকারে—যাকে আমি বাপ-মার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সব সময় ভাবি যার কথা,

যার মধ্যে আমার জীবনের সব আনন্দ জ'মে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেবো—তাকে যদি পাই, আর পাই সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক রাজসভায় : আমি যাবো সেই ডাইনির কাছেই—চিরকাল তাকে নিদারুণ ভয় ক'রেই এসেছি—কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর।'

গেলো সে বাগান ছেড়ে ; ফেনিয়ে-ওঠা যে-ঘূর্ণি ছাড়িয়ে ডাইনির বাসা, গিয়ে দাঁড়ালো তার ধারে। এ-পথে সে আগে কখনো আসেনি। এ-পথে ফোটে না ফুল, সাগর-ঘাস মাড়াতে হয় না। পার হ'য়ে আসতে হ'লো ধূ-ধূ ধূসর বালিরাশি, তারপর ঘূর্ণি। তার জল রেলগাড়ির চাকার মত ফোঁসফোঁস ক'রে ঘুরছে—যা-কিছু কাছে পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় অতল পাতালে। এই ভীষণ জায়গা দিয়েই যেতে হ'লো তাকে, ডাইনির দেশে যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পার হ'তে হ'লো একটা ডোবা, লিকলিকে পিছল কাদাগুলো টগবগ ক'রে ফুটছে, ডাইনি এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এর পরে একটা বনের মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অদ্ভুত।

চারদিকে যত গাছ আর ঝোপঝাড় সব ফণিমনসার জাত : যেন লক্ষমুণ্ড এক-একটা সাপ ফণা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে : ডালগুলো ঠিক লম্বা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জ্যান্ত পোকা ; মূল থেকে মাথা পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিকে অবিশ্রান্ত নড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। যা-কিছু তারা ধরে, এমন করেই আঁকড়ে ধরে যে জন্মেও সে সব আর ছাড়ানো যায় না।

এই ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট জলকন্যা চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো; ভয়ে ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগলো তার বুক। নিশ্চয়ই সে তখনই ফি'রে যেতো, যদি না তার মনে পড়তো রাজপুত্রের কথা—আর অমরতা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেলো। সে বেঁধে নিলে তার লম্বা চুল, যাতে ফণি-মনসায় আটকে না যায়; বুকের উপর হাত দু'টি চেপে ধ'রে মাছের মতো দ্রুতবেগে জলের ভিতর দিয়ে শোঁ ক'রে চ'লে গেলো সে; পার হ'য়ে এলো বিদঘুটে গাছগুলো, খামকাই তারা তার পিছনে ব্যগ্র হাত বাড়ালে।

এটা অবিশ্যি সে লক্ষ্য না ক'রে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের মুঠোর মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধরা, হাজার ছোট ছোট হাত লোহার বেড়ির মত শক্ত হ'য়ে চেপে বসেছে। সমুদ্রে ডুবে ম'রে কত মানুষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে; তাদের সাদা সাদা কঙ্কাল এই ফণিমনসার মুঠোর মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার ক'রে হাসছে। তারা জড়িয়ে রয়েছে ডাঙার জন্তুদের কতো কতো মুণ্ড, বুকের পাঁজর, আর আস্ত কঙ্কাল। নানা জিনিসের মধ্যে একটি জলকন্যাও দেখা গেলো; তাকে তারা আঁকড়ে ধ'রে গলা টিপে মেরেছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারা ছোট্ট রাজকন্যার চোখের সামনে!

যাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নির্ব্বিঘ্নে তো পার হ'লো। তারপর পিছল কাদা-ভরা একটা জায়গা; মস্ত মোটা মোটা শামুকরা সেখানে সুড়সুড় ক'রে বেড়াচ্ছে,

আর তারই মাঝখানে ডাইনির বাড়ী—যত দুর্ভাগা জাহাজ ডু'বে মরেছে, তাদের হাড় দিয়ে তৈরি। এখানে ব'সে ডাইনি কুচ্ছিৎ একটা কোলাব্যাঙকে আদর করছিলো, আমরা যেমন পোষা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা মোটা শামুকগুলোকে সে পায়রা ব'লে ডাকে—তারা তার সারা গায়ে অনায়াসে হাত পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনি বললে,—'কী চাও তুমি আমার কাছে তা আমি জানি। তুমি আস্ত একটা বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তা-ই হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুটে রাজকন্যা, এ তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি। লেজটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না—এই তো? চাও তুমি তার বদলে মানুষের মত দুটো ঠ্যাঙ—এই তো? তাহ'লে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসবেন, তুমি পাবে অমর আত্মা। তা-ই নয় কি?'

এ-কথা ব'লে ডাইনি এত চেঁচিয়ে হেসে উঠলো যে তার পোষা শামুক-ব্যাঙগুলো চমকে লাফিয়ে তার সারা গা থেকে পড়লো ঝ'রে।

'ঠিক সময়ে তুমি এসেছো', ডাইনি বলতে লাগলো। 'যদি সূর্য্যাস্তের পরে আসতে তাহ'লে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার জন্যে কিছু করবার সাধ্যি থাকতো না আমার। তোমাকে দেবো খানিকটা মন্ত্র-পড়া জল, তা নিয়ে তুমি সাঁৎরে ডাঙ্গায় যাবে, তীরে বসে সেটা খাবে। অমনি তোমার লেজ খ'সে পড়বে, গজিয়ে উঠবে লম্বা দুটো কাঠি, মানুষের অতি

আদরের পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ লাগবে, ভীষণ কষ্ট পাবে ; মনে হবে তোমার শরীরের ভিতর দিয়ে কেউ ধারালো একটা ছুরি চালিয়ে নিয়ে গেলো। এই রূপান্তরের পর যে যে দেখবে তোমাকে, সেই ব'লে উঠবে তুমি পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী কন্যা ; থাকবে তোমার ভঙ্গির লাবণ্য, এত হালকা পা কোনো নর্ত্তকীর নয় ; কিন্তু প্রতিবার পা ফেলতে তোমার অসহ্য যন্ত্রণা হবে—হাঁটছো যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে, রক্ত পড়বে স্রোতের মত। পারবে তুমি এত কষ্ট সহ্য করতে ? যদি পারো, তাহ'লেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।'

'পারবো, পারবো,' ক্ষীণস্বরে বললে রাজকন্যা। মনে পড়লো তার রাজপুত্রকে, এত দুঃখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে অমর আত্মা।

ডাইনি বলতে লাগলো,—'ভেবে ছ্যাখো—একবার মানুষ হয়েছো কি আর কোনোদিন জলকন্যা হ'তে পারবে না। পারবে না কখনো বোনেদের কাছে ফিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ী আর যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসলো না যে তোমার জন্যে সে বাপ মাকে ছাড়তেও প্রস্তুত হ'তে পারে, যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনায় আর প্রার্থনায় জড়িয়ে যেতে না পারো, যদি না পুরোহিতের মন্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাহ'লে যে অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখ্খনো না। যে-রাত্রে রাজপুত্র অন্য একজনকে

বিয়ে করবে, সে-রাত্রি ভোর হ'তেই তোমার মৃত্যু। দুঃখে তখন ভেঙে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে ভাসবে তুমি।'

মুমূর্ষুর মত ম্লানমুখে বললে জলকন্যা,—'তবু-তবু আমি সাহস করবো।'

'আর একটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো—এত কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলায় তোমাদের সকলের কণ্ঠই মধুর, তার মধ্যে সব চেয়ে মধুর তোমার কণ্ঠ। তা-ই দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবে ভেবেছো তো? কিন্তু তোমার এই কণ্ঠস্বরই আমি চাই। তোমার মধ্যে সব চেয়ে যেটা ভালো জিনিস, তা-ই এই মন্ত্র-পড়া জলের দাম; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরি করবো আমি,—খোলা তলোয়ারের মত ধার হবে তো তার সেই জন্যেই।'

জলকন্যা বললে,—'আমার কণ্ঠই যদি কেড়ে নিলে তাহ'লে আমার আর রইলো কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবো?'

'রইলো তোমার অঙ্গের লাবণ্য, তোমার ভঙ্গির শ্রী, তোমার কথা-ভরা দৃষ্টি। এ-সব জিনিস নিয়ে মানুষের তরল চিত্তকে মুগ্ধ করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তো? জিভ বার করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখবো। মন্ত্র-পড়া জলের এই দাম।"

'তা-ই হোক্!' বললে রাজকন্যা।

ডাইনি তখন ফুটন্ত কড়াইতে সেই বিষ তৈরি করতে লাগলো। আগে সে কড়াইটা ব্যাঙ-শামুক দিয়ে বেশ ভালো ক'রে মুছে

নিলে; বললে,—'বিশুদ্ধভাবে সব করতে হয়।' তারপর তার বুকে একটু আঁচড় কাটলো, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়লো কড়াইতে আল্‌কাৎরার মতো। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক রকম মশলা ঢালা হ'লো। তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো এমন বিকট বীভৎস মূর্ত্তিতে যে দেখলে ভয়ে মূর্চ্ছা যেতে হয়। তার ভিতর থেকে আবার কঁকানি-গোঙানির শব্দ আসছে—অনেকটা কুমীরের কান্নার মত। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পরিষ্কার জলেরই মতো টলটলে দেখা গেলো—তৈরি হয়েছে।

ডাইনি বললে জলকন্যাকে, 'তবে, এই নাও।' সঙ্গে-সঙ্গে তার জিভটা টেনে কেটে ফেললো। বোবা হ'য়ে গেলো ছোট্ট জলকন্যা—না পারে সে কথা বলতে, না পারে গাইতে। যাবার সময় ডাইনি ব'লে দিলে, 'যদি ফণিমনসারা তোমাকে ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে দিয়ো—তাদের ডানাগুলি হাজার টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে যাবে।'

কিন্তু এ-উপদেশের কোনো দরকারই ছিলো না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মত ঝল্‌মল্‌ করছে—তা-ই দেখেই ভয়ে ম'রে গেলো ফণিমনসারা। পার হয়ে এলো সে ভীষণ বন, পার হ'য়ে এলো ডোবা, ছাড়িয়ে এলো ফেনালো ঘূর্ণি।

এইবার সে পিতার প্রাসাদের দিকে তাকালো। নিবে গেছে সভার আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন ক'রে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে না। শেষবারের মত ছেড়ে যেতে হচ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক

প্রায় গেলো ভেঙে। লুকিয়ে সে গেলো বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি ক'রে ফুল নিলে ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেলো অনেকবার ; তারপর ঘন-নীল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠলো সে, ওপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য্য ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌঁছিয়ে পরিচিত সাদা সিঁড়ি দিয়ে সে উ'ঠে এলো। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে, ছোট্ট জলকন্যা শিশিতে ভরা মন্ত্র-পড়া জল ঢেলে দিলে গলায়। ধারালো ছুরির মত সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেলো, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো সে। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে জাগলো সে ; তার সমস্ত শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। যাক্, পুড়ে যাক্। তবু তো সে পেলো তার এত আরাধনার ফল, দেখতে পেলো অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, কয়লার মত কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে। লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিলে। এ কী! কোথায় তার মাছের মতো লেজ? কোমল মসৃণ দু'টী পা নেমে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার : বৃথাই সে চেষ্টা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলে সে কে, কী করেই বা এখানে এলো। উত্তরে সে তার উজ্জ্বল নীল চোখ দু'টো বড় ক'রে মেলে তাকালো, একটু হাসলো—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না। রাজপুত্র তাকে হাতে ধ'রে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলো। ডাইনি ঠিকই বলেছিলো, তার এমন লাগলো যেন খোলা

তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সে-কষ্টটা অনায়াসেই সে সহ্য করলো, এগিয়ে গেলো সে দক্ষিণে হাওয়ার

কোথায় তার মাছের মতো লেজ? কোমল মসৃণ দু'টি পা নেমে এসেছে যে!

মত হালকা পায়ে; যে দেখলো তাকে সে-ই অবাক হ'লো তার লঘু লীলার লাবণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকলো সে, তার জন্যে আনা হ'লো রেশমের আর মসলিনের বাহারে কাপড়; সেখানে যারা থাকে, তার মত সুন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না পারে কথা বলতে, না পারে গান গাইতে। রাজা-রাণী আর রাজপুত্রের সামনে রোজ গান করে কয়েক জন দাসী, তাদের রেশমি কাপড়ে সোনালি বুটী তোলা; তাদের মধ্যে একজনের পরিষ্কার সুন্দর গলা শু'নে রাজপুত্র খুসিতে হাত-তালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকন্যার মনে বড় কষ্ট হ'লো; সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর ছিলো তার গান। সে ভাবতো, 'হায়রে, তার জন্যে যে আমি আমার এমন কণ্ঠস্বর চিরকালের মত খুইয়ে বসেছি তা' তো সে জানেই না!'

দাসীরা নাচতে সুরু করলো। তখন উঠলো আমাদের জলকন্যা; লীলায়িত শুভ্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মৃদুভঙ্গিতে যেন হাওয়ায় সে ভেসে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফু'টে উঠলো তার অঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যের ছন্দ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-কথা ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো তা' দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবিড় হ'য়ে মর্ম্মে গিয়ে বাজলো।

সকলেই মুগ্ধ হ'লো, সব চেয়ে মুগ্ধ হ'লো রাজপুত্র। সে তাকে ডাকলে আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী। বার-বার নাচলো সে, যদিও প্রতিটি পা ফেলতে অসহ্য যন্ত্রণা হ'লো তার। রাজপুত্র ব'লে দিলে সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে; তারই পাশের ঘরে মখমলের বালিসে মস্‌লিনের

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোষাক তৈরি করিয়ে দিলেন; ঘোড়ায় চ'ড়ে সে যখন বেরোবে, এই কুড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার সঙ্গে। এক সঙ্গে কত সুগন্ধি বনে তারা বেড়ালো, সবুজ ডালপালা ছুঁয়ে-ছুয়ে গেলো কাঁধ, নতুন পাতার বেড়ে লুকানো পাখীদের গানের জলসায় কী স্ফূর্ত্তি। উঠলো জলকন্যা তার সঙ্গে খাড়া পাহাড়ে, নরম পা ফেটে রক্ত বেরুলো, অনুচরেরা ছু'টে এলো হাঁ-হাঁ ক'রে। কিন্তু মুচকি একটু হেসে সে উঠলো রাজপুত্রের সঙ্গে আরো উঁচুতে; সেখানে দেখা যায় মেঘেরা পায়ের নিচে হেসে-খেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে; ছুটছে এ ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পাখী দেশান্তরে চলেছে উ'ড়ে।

রাত্রে, প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমে বিভোর, রাজকন্যা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকে; তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

এক রাত্রে, তখন সে সিঁড়িতে ব'সে পা ধুচ্ছে, তার বোনেরা সাঁৎরে এলো সেখানটায়, একসঙ্গে, হাতে হাত ধ'রে, গান গাইতে-গাইতে। কী করুণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের; বোনেরা তাকে দেখেই চিনতে পারলে; সে চ'লে আসায় তাদের বাড়ীতে কত দুঃখ সে-কথা তাকে না-ব'লে পারলে না। এর পর থেকে বোনেরা রোজ রাত্রেই আসে; একবার সঙ্গে ক'রে বুড়ো ঠানদিকেও নিয়ে এসেছিলো—অনেকদিন জলের উপরকার দেশটি দেখেননি তিনি। একদিন সাগর-রাজাও এলেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট; কিন্তু এরা দু'জন ডাঙার খুব

কাছে ভিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ের সঙ্গে তাই কোনো কথাই বলা হ'লো না।

এদিকে ছোট্ট জলকন্যাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রিয় হ'য়ে উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মীই, তার বেশী কিছু নয় সে ; ফুটফুটে মিষ্টি খুকুমণি—তাকে বিয়ে করবার কথা তার মাথায়ই এলো না কখনো। কিন্তু বিয়ে না করলে কী ক'রে সে পাবে অমর আত্মা ? বিয়ে তাকে করতেই হবে —নয় তো ফেনা হ'য়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ধাক্কা স'য়ে।

রাজপুত্র যখন তাকে বুকে নিয়ে আদর করেন, তার চোখ যেন জিজ্ঞেস করে,—'তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসো না আমাকে ?'

রাজপুত্র বলেন,—'সব চেয়ে তোমাকেই তো ভালোবাসি— তোমার মত ভালো আর কে ? তুমিও তো আমাকে কম ভালো-বাসো না ; একবার একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলাম, আর বোধ হয় কখনোই দেখবো না—তুমি অনেকটা তার মতোই। ছিলেম একবার এক জাহাজে, ডুবলো জাহাজ, ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে ঠেকলাম গিয়ে তীরে এক মন্দিরের ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পূজা-অর্চ্চনা নিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট্টটি কুড়িয়ে পেলো আমাকে, প্রাণ বাঁচালো আমার। একবার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তার ছবি আমার স্মৃতিতে আঁকা হ'য়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো-

বাসতে পারবো না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, কী,ক'রে পাবো তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেইজন্যেই বুঝি এসেছো আমাকে সান্ত্বনা দিতে। আমাকে কখনো ছেড়ে যেয়ো না।'

জলকন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, 'হায়রে, সে তো জানে না আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। দুরন্ত ঢেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে তু'লে নিয়ে গিয়েছিলাম বনের মধ্যে সেই মন্দিরের ধারে; বসেছিলাম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে—এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে, এই আশায়। তারপর দেখলাম সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে—তাকেই সে ভলোবাসে আমার চেয়ে বেশি!' সে আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, জলকন্যা তো কাঁদতে পারে না। 'সে-মেয়ে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পারবে না, আর তো তাদের দেখা হবে না। আমি আছি সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি; আমি তাকে ভালবাসবো, সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করবো তাকেই।'

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে,—প্রতিবেশী রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে। মস্ত জাহাজ সাজানো হচ্ছে সেইজন্যেই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে বেরোচ্ছেন, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকন্যাকে আনতে, লোকজন সৈন্য-সামন্ত বিস্তর যাবে সঙ্গে।' এ সব কথা শু'নে জলকন্যা মুচকি হাসে; রাজপুত্রের মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললেন,—'আমাকে তো যেতে

হচ্ছে। সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে যেতেই হবে আমাকে, আমার মা-বাবার ইচ্ছা তা-ই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবিশ্যি আমার পক্ষে তাকে ভালোবাসাও অসম্ভব; মন্দিরের সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে ব'লে কি আর সে-ও তেমন হবে! যদি বিয়ে করতেই হয়, বরং তোমাকেই করবো—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী, মুখে কথা নেই, চোখ-ভরা কথা।' এই ব'লে সে তার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে একটু আদর করলে; সঙ্গে-সঙ্গে জলকন্যার মন মানুষের সার্থকতা আর অমর আনন্দের মধুর স্বপ্নে দোলা দিয়ে উঠলো।

জমকালো জাহাজে চ'ড়ে প্রতিবেশী রাজার দেশে যেদিন যাত্রা, সেদিন রাজপুত্র বললে জলকন্যাকে, জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়ে,—'লক্ষ্মী খুকু, সমুদ্রে তোমার ভয় করে না তো?' তারপর বললে, 'ঝড়ে সমুদ্র কেমন পাগল হ'য়ে ওঠে; জলের নিচে থাকে কতো অদ্ভুত মাছ, কতো আশ্চর্য্য জিনিষ যা ডুবুরিরা ছাখে।' জলকন্যা একটু হাসলো এ-সব কথা শু'নে,—সমুদ্রের তলায় কী আছে না আছে তা' কি তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ?

রাত্রে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের ভিতরে তাকিয়ে সে বসে রইলো। জাহাজ চলেছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠছে ফেনিয়ে; সেদিকে তাকাতে তাকাতে তার মনে হ'লো সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে,

দেখতে পাচ্ছে তার ঠানদির রূপালি মুকুট। তারপর দেখলো তার বোনেরা জল থেকে উঠে আসছে, ভারি ম্লান তাদের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসলো তাদের দিকে তাকিয়ে; সে যেমনটি চেয়েছিলো ঠিক তেমনটি সব ঘটছে এই কথা তাদের বলতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়লো একজন খালাসি। তাকে দেখেই বোনেরা হঠাৎ এমন ডুব দিলে জলের মধ্যে যে খালাসি ছোকরা মনে করলো জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখছিলো—আর-কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ ঢুকলো রাজধানীর বন্দরে। বাজলো শঙ্খ, বাজলো জয়ঢাক, সৈন্যেরা মিছিল ক'রে গেলো সহরের ভিতর দিয়ে, উড়লো নিশেন, চল্‌লো ঝলসানো সঙিন। রোজই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকন্যা তখন সেখানে নেই, তাঁকে পাঠানো হয়েছে দূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবংশের সবরকম গুণপনা সেখানে তিনি আয়ত্ত করছেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরলেন দেশে।

এই আশ্চর্য্য রাজকন্যাকে দেখতে ছোট্ট জলকন্যা কিছু উৎসুকই ছিলো—যখন দেখলো স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো—সুন্দরী বটে, এত সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দ্যাখেনি!

রাজকন্যার গায়ের চামড়া এমন সাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফু'টে বেরিয়েছে: বাঁকা ভুরুর নিচে ঝক্‌ঝক্ করছে কালো একজোড়া চোখ।

'এ যে সেই!' রাজপুত্র ব'লে উঠলো তাকে দেখেই। 'এই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো—মড়ার মত যখন প'ড়ে ছিলাম সমুদ্রের ধারে!' সলজ্জ বধূকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর বোবা কুড়িয়ে-পাওয়া জলকন্যাকে বললে,—'আজ আমার সুখের সীমা নেই। যা আমি আশা করতে সাহস পাইনি তা-ই হয়েছে। আমার সুখে তুমিও কি আজ সুখী হবে না?—আশে-পাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো।'

বোবা জলকন্যা দুঃখে একবার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরলো। এখনই যেন ভেঙে যাচ্ছে তার বুক; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয়নি, তার মরণের দিন!

আবার মন্দিরে বাজলো শঙ্খ, দূতেরা বেরুলো সহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বেদীতে জ্বললো রূপোর প্রদীপে সুগন্ধি আগুন, পুরোহিত সোনার ধূপতিতে ধূনো দিলে, বর-বধূ হাতে হাত রাখলো, উচ্চারিত হ'লো বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোট্ট জলকন্যা পরেছে আজ রেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকন্যার ওড়নার আঁচল ধ'রে পিছনে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু না দেখছিলো তার চোখ এই শুভ অনুষ্ঠান, না শুনছিলো সে গুরু গম্ভীর বিবাহের বাজনা; শুধু সে ভাবছিলো তার আসন্ন অবসানের কথা। তার মনে হ'লো পৃথিবী ও স্বর্গ দুই-ই সে হারালো!

সেই সন্ধ্যাতেই বর-বধূ জাহাজে গেলো ফিরে। গর্জ্জালো কামান, হাওয়ায় উড়লো নিশেন, আর জাহাজের খোলা ছাদে সোনালি কাপড়ের অপরূপ শামিয়ানার তলায় কিংখাপের নরম জাজিম পাতা হ'লো—বর-বধূ রাত্রে সেখানে শোবেন। অনুকূল হাওয়া উঠলো; নীল জলের ওপর দিয়ে জাহাজ হালকা ছন্দে চললো দু'লে দু'লে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাশি-রাশি রঙিন আলো জ্ব'লে উঠলো, ছাদের উপর সুরু হলো নাচ। জীবনে প্রথমবার সমুদ্র থেকে মাথা তু'লে যে-দৃশ্য সে দেখেছিলো জলকন্যার তা' মনে প'ড়ে গেলো। এ-দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে হ'লো নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির হালকা পায়ে সে ঘু'রে বেড়াতে লাগলো। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো সবাই, এত সুন্দর সে-ও কখনো নাচে নি। ভীষণ লাগলো তার ছোট ছুটি পায়ে; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলোই না—অনেক বেশি কষ্ট যে তার মনে!

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্য সে ছেড়ে এসেছে বাড়ী-ঘর, বাপ-মা, হারিয়েছে তার অপরূপ কণ্ঠস্বর, রোজ সয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মানুষটি একফোঁটা সন্দেহও করে না তার জন্যেই তো সে এত সব করেছে! আজই শেষ! এর পরে সে আর নিঃশ্বাসে সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের জীবন; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ। আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে

আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। জাহাজের ওপর ব'য়ে চলেছে ফূর্ত্তির স্রোত; সে-ও দুপুর রাত পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসলো, নাচলো—মনের মধ্যে তার নিঃশেষ-হ'য়ে-যাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেলো তার সুন্দরী বধূকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চুপচাপ; হাল ধ'রে একা একজন মাল্লা দাঁড়িয়ে। জাহাজের সিঁড়িতে সাদা হাত দুটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পূবের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। কখন ভোর হবে? সূর্য্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার। তার বোনেরা জল থেকে এলো উ'ঠে, মৃত্যুর মতো ম্লান তাদের মুখ; এত সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিলো, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর ক'রে উড়তো—এখন আর নেই।

কী হ'লো চুল?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনিকে,' তারা বললে। 'যাতে তোমাকে মরতে না হয়, যাতে সে তোমার জন্যে কিছু করে। ডাইনি দিয়েছে এই ছুরিটা তোমার জন্যে, এই নাও। সূর্য্য ওঠবার আগেই এটা দেবে রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে; যেই তার গরম রক্তের ফোঁটা তোমার পায়ের উপর পড়বে, অমনি তোমার লেজ আবার হ'য়ে যাবে। আবার হবে তুমি জলকন্যা, সমুদ্রের ফেণা হ'য়ে যাবার আগে বেঁচে নেবে পুরো তিনশো বছর। শিগগির করো, শিগগির! সূর্য্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, কি মরবে তুমি।'

'বুড়ো ঠানদি আমাদের রোজই কাঁদে তোমার জন্যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হ'য়ে গেছে তাঁর, মাথার চুল সব প'ড়ে গেছে —যেমন গেছে আমাদের চুল ডাইনির কাঁচিতে। মারো, মারো রাজপুত্রকে, এসো আমাদের কাছে। এক্ষুনি ! এক্ষুনি ! দেখছো না পূবের আকাশে গোলাপি আভা, সূর্য্য উঠলো ব'লে। সূর্য্য উঠলেই তো তোমার শেষ !'

এই ব'লে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা গেলো মিলিয়ে।

বর-বধু যেখানে শুয়ে, ছোট্ট জলকন্যা তার সোনালি পরদা সরিয়ে ঢুকলো ; তাকিয়ে দেখলো রাজপুত্রকে, চুমু খেলো তার কপালে ; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো আলো প্রতি মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অস্ফুট-স্বরে কী বললে—তার বধূর নাম ; তার স্বপ্ন সে দেখছে, শুধু তারই—এদিকে জলকন্যার হাতে কাঁপছে সেই সর্ব্বনেশে ছুরি।

হঠাৎ সে দূরে সমুদ্রে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারালো জিহ্বা ; জ্বলন্ত লাল ঢেউগুলো লাফিয়ে উঠলো সবদিকে ; ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নেচে চল্‌লো যেন এক পাগলী মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছোপানো। তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে জলকন্যা তাকালো তা' ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হ'য়ে এলো ; তারপর সে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে, নিশ্চিত বুঝতে পারলে সে, তার শরীর আস্তে-আস্তে ফেণা হ'য়ে গলে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠলো সূর্য্য ; এমন কোমল উষ্ণ হ'য়ে

আলোর পাপ্‌ড়িগুলো পড়লো তার সারা গায়ে যে জলকন্যা প্রায় বুঝতেই পারলে না যে সে মরছে। এখনো সে দেখছে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে, তার মাথার ওপর ভাসছে হাজার হাজার স্বচ্ছ সুন্দর মূর্ত্তি; এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের সাদা পাল, অরুণ উষার আলোর নাচ! মাথার ওপরে সেই অশরীরী জীবদের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে সুর—তা' এমনই মধুর, এমনই কোমল যে মানুষের কানে সে শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মানুষের চোখে তাদের মূর্ত্তি। তাকে ঘি'রে তারা ঘু'রে-ঘু'রে উ'ড়ে বেড়ালো,—যদিও পাখা তাদের নেই—নিজেদেরই লঘুতা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষটায় জলকন্যা দেখলে যে তার শরীরও ওদের মত হালকা হ'য়ে যাচ্ছে; মনে হ'লো কে যেন তাকে সমুদ্রের ফেনা থেকে আস্তে-আস্তে ঠেলে তুলছে ওপরের দিকে।

'কোথায় আমি? যাচ্ছি কোথায়?' সে জিজ্ঞেস করলে। তার কণ্ঠস্বর বেরুলো, শোনালো ঠিক ঐ আকাশকন্যাদের মতো। সে শব্দ অলৌকিক, শান্ত, স্নিগ্ধ! তার মধুর কোমলতা অন্তরের গহনতলে নিবিড় হ'য়ে ঝ'রে পড়লো।

আকাশ-কন্যাদের একজন বললো,—'তুমি যে আমাদের মধ্যে এসে প'ড়েছো! আজ হ'তে তুমিও যে আকাশ-কন্যা! জলকন্যার অমর আত্মা নেই; কোনো মানুষের ভালোবাসা পেলে তার আত্মা অমর হ'য়ে ওঠে! তার অনন্ত জীবন অপরের ওপর নির্ভর করে।

'অমর আত্মা আকাশ-কন্যাদেরও নেই ; আমরা তা' অর্জ্জন করি নিজেদের ভাল কাজের জোরে। আমরা উড়ে যাই গরম দেশে ; যেখানে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বিষাক্ত হাওয়ার ঝাপটায় ধুঁকছে। আমাদের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে হাওয়ার বিষ চলে যায়, তাদের প্রাণ বাঁচে। বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই প্রাণের শীতল হাওয়া, তাকে সুরভিত ক'রে তুলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ; এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে বিলিয়ে যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিনশো বছর ধ'রে এমনি সুকীর্ত্তির জোরে আমরা অমরতা লাভ করি—মানুষের চিরন্তন সার্থকতার অংশীদার হই। আর তুমি ছোট্ট জলকন্যা—তুমি তোমার প্রাণপণ ক'রে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছো ; হৃদয়ের প্রেরণায় মানুষের প্রেমের জন্য এত করেছো, এত দুঃখ পেলে আমাদের মতো মানুষের সেবায়—এখন তুমি অপরূপ দেহ নিয়ে উঠে এসেছো পরীদের আকাশে ; এখন তিনশো বছর ধ'রে সুকাজ করলে অমর আত্মা লাভ করতে পারবে।'

ছোট্ট জলকন্যা সূর্য্যের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার সরল কোমল দু'টো স্বচ্ছ দীঘল বাহু ; তারপর—জীবনে প্রথমবার জলে ভিজে উঠলো তার চোখ।

এদিকে জাহাজে সবাই উঠেছে জেগে, আবার সুরু হয়েছে উৎসব। সে দেখলো রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে ব'সে আছে ; তাকে খুঁজে না-পেয়ে তাদের মন বড় খারাপ ; ম্লানমুখে তারা তাকিয়ে আছে নিচুমুখে ঢেউয়ের ফেনার দিকে—যেন তারা

জানে ঐ সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হ'য়ে জলকন্যা রাজপুত্রের কপালে চুমু দিলে, হাসলো তার দিকে তাকিয়ে; তারপর আকাশ-কন্যাদের সঙ্গে উ'ড়ে মিলিয়ে গেলো জাহাজের ওপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া গোলাপি মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেলো দিগন্ত ছাড়িয়ে।

'তিনশো বছর পরে আমরাও যাবো স্বর্গরাজ্যে,' সে বললে।

একজন কানে-কানে বললে। 'আরো আগেও যেতে পারি। যে-সব মানুষের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভিতর অদৃশ্য হ'য়ে আমরা উ'ড়ে যাই; আর যখনই আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ছেলে যে তার মা-বাবার বুক, মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাঁদের স্নেহের পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই ঈশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কমিয়ে দেন।

'শিশুরা কেউ জানে না যে আমরা ঘরে ঘরে উ'ড়ে বেড়াচ্ছি; জানে না, তাদের ভালো কাজে খুসি হ'য়ে আমরা একবার হাসলেই তিনশো থেকে একটা বছর ক'মে যায়। কিন্তু যখনই আমরা দেখি বদমেজাজি দুষ্টু ছেলে, মনের দুঃখে আমরা কাঁদি, আর আমাদের প্রতি অশ্রুবিন্দু আমাদের পরীক্ষার সময় একদিন ক'রে বাড়িয়ে দ্যায়।'

রাজার নতুন পোষাক

এক ছিলো রাজা, তাঁর ছিলো বেজায় জামা-কাপড়ের সখ। কোনো রাজার সখ থাকে হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ-খেলা; কোনো রাজার সখ থাকে গুণীদের গান শোনা সোনা-বসানো খাটে শুয়ে—কিন্তু এই যে আমাদের রাজা, তাঁর সখ ছিলো সাজগোজের, ছবির মতো সাজতে পারলেই তিনি খুব খুসি। অত যে তাঁর ঐশ্বর্য্য, তা' খরচ হ'তো কেবল জামা-কাপড় কিনে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নতুন পোষাক চাই তাঁর, সেজে-গুজে গাড়ি চড়ে, একবার ঘু'রে আসতে পারলে আর কিছুই তিনি চাইতেন না। লোকে যেমন বলে, 'রাজা বসেছেন তাঁর সভায়', তাঁর সম্বন্ধে সবাই বলতো, 'রাজা আছেন তাঁর সাজ-ঘরে।'

মস্ত সহরে তিনি থাকেন, দিন-রাত সেখানে ফূর্ত্তি আর তামাসা। রোজ লোক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। একদিন এলো দু'জন জোচ্চোর; এসেই ব'লে বেড়ালো তারা তাঁতী, এমন মিহি সুতোর কাপড় তারা বুনতে পারে যা কেউ ভাবতেও পারে না। আশ্চর্য্য তার রঙ্, আশ্চর্য্য বুনোন। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য একটা গুণ সে কাপড়ের—যদি কেউ হয় নিরেট বোকা, কি তার কাজের অযোগ্য, তাহ'লে তো সে তা' চোখেই দেখতে পাবে না।

'চমৎকার, চমৎকার!' রাজা মনে-মনে ভাবলেন। 'ও-কাপড় যদি আমি পরি, তা'হলে বুঝতে পারবো আমার রাজত্বে কে-কে আছে অযোগ্য, আর কোন্‌গুলো নিরেট বোকা। কী মজাই হবে তখন। এই কাপড়ই আমার চাই—এক মুহূর্ত্ত দেরি না হয়।'

রাজবাড়ীর সামনে জোচ্চোররা পরামর্শ করছে

এই ভেবে তিনি জোচ্চোরদের অনেকগুলো টাকা আগাম দিয়ে দিলেন—এক্ষুনি কাজ আরম্ভ হোক্। তারা খাটালো মস্ত দুটো তাঁত, আর এমন ভাব দেখালো যেন সারাদিন সেখানে কাজ করছে। আসলে কিন্তু তাদের তাঁতে মোটেই সুতোর বালাই নেই। তারা চেয়ে নিলে সাত কাহন সোনা

আর সাত বস্তা সব চেয়ে দামি রেশম—নিয়ে সেগুলো আত্মসাৎ করলে। তারপর শূন্য তাঁতে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত কাজ করবার ভাণ করতে লাগলো।

রাজা ভাবলেন, 'দেখে আসি ওদের কাজ কতদূর এগোলো।' কিন্তু যেই তাঁর মনে পড়লো আযোগ্যরা সে-কাপড় চোখে দেখতে পাবে না, কেমন একটু অস্বস্তি লাগলো তাঁর। নিজের সম্বন্ধে তাঁর কোনো ভয় আছে এ-কথা অবিশ্যি তাঁর মনে হ'লো না; তবু, আর-কেউ আগে গিয়ে একবার দেখে আসুক না ব্যাপারখানা কী। রাজ্যের সবাই সে কাপড়ের আশ্চর্য্য গুণের কথা জেনে গেছে; সবাই ভাবছে—এবার দেখা যাবে অমুক লোক কী ভীষণ বোকা।

রাজা ভাবলেন, 'আমার বুড়ো মন্ত্রীকেই আগে পাঠাবো। তিনি তো খুব বুদ্ধিমান শুনি, আর তাঁর কাজ তাঁর চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তিনিই ঠিক বুঝবেন, কাপড়টা কেমন হচ্ছে।'

বুড়ো মন্ত্রী গেলেন সেই প্রকাণ্ড বাড়ীতে, যেখানে দুই জোচ্চোরে ব'সে-ব'সে শূন্য তাঁতে কেবলি ঠোকাঠুকি করছে।

'কী কাণ্ড!' বুড়ো মন্ত্রী নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বড় ক'রে তাকালেন, 'আমি তো কিছুই দেখিতে পাচ্ছিনে।' কিন্তু মুখে তিনি সে-কথা প্রকাশ করলেন না।

দুই জোচ্চোর সবিনয়ে তাঁকে কাছে আসতে বললে। 'দেখুন, রঙ গুলো কি ভালো নয়? বুনোন কি ঠিক হচ্ছে না?'

খালি তাঁতটার দিকে বার-বার আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলো, আর বুড়ো মন্ত্রীর চোখ কেবলই বড় হ'তে লাগলো। কিন্তু কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না, কেননা দেখবার কিছুই ছিলো না তো ওখানে।

'রামচন্দ্র! সত্যি কি আমি এতই বোকা? আমি তো কখনো তা' ভাবিনি, লোকেও তা' মনে করে না। কী উপায় হবে, লোকে জানলে! আমি মন্ত্রী হবার অযোগ্য? তাই তো, তাই তো!'

এই ভেবে বুড়ো মন্ত্রী তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে মিট্‌মিট্‌ ক'রে তাকিয়ে বললেন,—

'তোমাদের কাজ খুব ভালো হয়েছে, আমি মহারাজকে এ-কথাই বলবো যে আমি দেখে খুব খুসি হয়েছি। চমৎকার রঙ্‌, আর কী অদ্ভুত কারুকার্য্য!'

'বেশ কথা, সে তো বেশ কথা', জোচ্চোরেরা বললে। তারপর তারা গম্ভীরমুখে রঙ্‌গুলোর নাম বললে, বিচিত্র নক্সাটা বুঝিয়ে দিলে ভালো ক'রে। মন্ত্রী মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপর রাজার কাছে গিয়ে সেই কথাগুলোই আউড়ে গেলেন।

এদিকে জোচ্চোরেরা আরো টাকা নিলো, নিলো আরো সোনা, আরো রেশম। বললে কাপড় বুনতে ও-সব লাগবে। সব তারা থলিতে ভ'রে রাখলে, এতটুকু সুতোও তাঁতে উঠলো না। কিন্তু সেই তাঁতের সামনে ব'সে তারা একটানা কাজ ক'রে যেতে লাগলো।

কয়েকদিন পর রাজা তাঁর একজন খুব বিচক্ষণ পারিষদকে কাপড় দেখতে পাঠালেন। মন্ত্রী যা' দেখেছিলেন, ইনিও তাই দেখলেন। তাকাতে তাকাতে তাঁর চোখে ব্যথা হ'য়ে গেলো, কিন্তু যেহেতু খালি তাঁত ছাড়া আর-কিছু নেই, খালি তাঁত ছাড়া আর-কিছু তিনি দেখতে পেলেন না।

'সুন্দর হচ্ছে না জিনিসটা? কী বলেন?' ব'লে জোচ্চোরেরা নানাদিক্ থেকে কাল্পনিক কাপড়টা দেখালো, কাল্পনিক নক্সা-গুলোর ছাঁদ বুঝিয়ে দিলে ভালো ক'রে।

পারিষদ ভাবলেন, 'আমি তো বোকা নই। তবে কি রাজপারিষদ হবার অযোগ্য? কিন্তু এ-কথা তো কেউ কখনো বলেনি। যা-ই হোক্, এদের টের পেতে দিলে চলবে না।' এই ভেবে তিনি সেই অদৃশ্য বস্ত্রের খুব প্রশংসা করলেন,—'সুন্দর রঙ্, সুন্দর নক্সা।' তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, যা কাপড় হচ্ছে আপনার, এমনটি আর কখনো কেউ দেখেনি।'

এতদিনে সহরের লোকের মুখে আর-কোনো কথা নেই। না জানি কী আশ্চর্য্য কাপড় বোনা হচ্ছে রাজার জন্যে—এমন আর কি কেউ কোনো দিন দেখেছে? রাজার খেয়াল হ'লো নিজে গিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখে আসবেন। সাড়া পড়ে' গেলো সহরে। সঙ্গে গেলো তাঁর একদল বাছাই-করা লোক—তার মধ্যে আছেন সেই বুড়ো মন্ত্রী, আছেন সেই বিচক্ষণ পারিষদ। পুরোদমে জোচ্চোরেরা তখন বুনছে, প্রাণপণে বুনছে—তার না আছে টানা, না আছে পোড়েন।

'কী সুন্দর! না?' বুড়ো মন্ত্রীমশাই আর সেই বিচক্ষণ
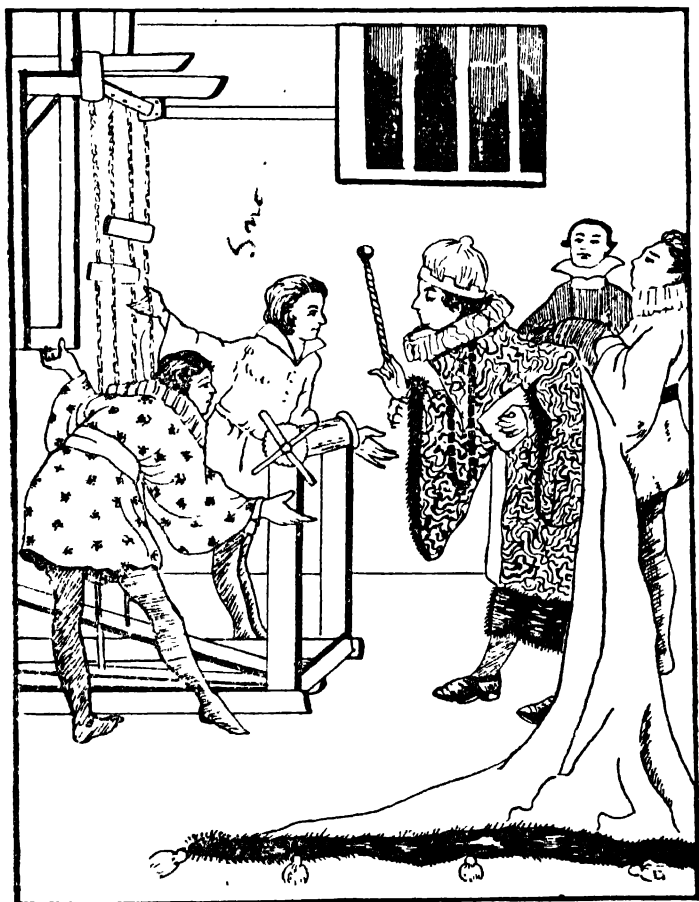
ভারিক্কি চালে রাজা বললেন,—"খুবই সুন্দর হয়েছে"

পারিষদ প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠলেন। 'মহারাজ, নক্সাটা

একবার দেখুন। আর রঙেরই বা কী বাহার!' উৎসাহের ঝোঁকে খালি তাঁতটা বার-বার তাঁরা আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন—কেননা তাঁরা তো জানেন অন্য সবাই সবই দেখতে পাচ্ছে চমৎকার!

রাজা মনে-মনে চমকে উঠলেন।—'কী সর্ব্বনাশ! আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে! কী সর্ব্বনাশ! বোকা নাকি আমি? না কি রাজা হবার অযোগ্য? এর চেয়ে সর্ব্বনাশ আর কী হ'তে পারে আমার!' তারপর সবাইকে শুনিয়ে ভারিক্কি চালে বললেন,—'খুবই সুন্দর হয়েছে। আমরা সানন্দে এর প্রশংসা করছি।' মৃদুভাবে মাথা নেড়ে গম্ভীরমুখে তিনি শূন্য তাঁতের দিকে তাকালেন—হায়রে, এ-কথা বলবার তাঁর উপায় নেই যে কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সঙ্গে দলবল যারা ছিলো তারা চোখ বড় ক'রে বার-বার তাকালো, কিন্তু অন্যদের চাইতে বেশি কিছু দেখতে পেলো না তারা। তবু সমস্বরে তারা রাজার কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো, 'খুব সুন্দর তো!' 'কী সুন্দর'! 'কী আশ্চর্য্য'! 'কী চমৎকার!' এ-সব ছাড়া কারো মুখে অন্য কথা নেই। চারদিকে ফুর্ত্তির বান ডাকলো যেন; সবাই বললে,—সামনের মাসে রাজপ্রাসাদ থেকে যে-মস্ত মিছিল বেরোবে তাতে মহারাজ এই পোষাকটিই যেন পরেন।' রাজা খুসি হ'য়ে জোচ্চোরদের উপাধি দিলেন—'তন্তুবায় চন্দ্রকলা।'

কাল মিছিল বেরোবে। সন্ধ্যে থেকে সারারাত ষোলোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে জোচ্চোররা খেটেছে। সহরের লোক

দেখছে আর বলাবলি করছে, 'সাবাস বটে ! কাল ভোরের আগে পোষাক একেবারে তৈরি ক'রে দেয়া তো চাই।' জোচ্চোররা এমন ভাণ করলে যেন তাঁত থেকে কাপড় নামাচ্ছে, প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে বাতাসকে তারা ফালি ক'রে ফাড়লে ; সুতো-ছাড়া ছুঁচ দিয়ে তারা সেলাই করলে ; তারপর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'পোষাক তৈরি !'

রাজা স্বয়ং এলেন তাঁর জমকালো ঘোড়সওয়ারের দল নিয়ে। জোচ্চোররা কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো, তারপর এমনভাবে হাত তুললো যেন কিছু ধ'রে আছে। 'এই তো ইজের ; আর এইটি কুর্ত্তা, এই চাপকান,' এমনি তারা বলতে লাগলো। 'মাকড়শার জালের মত হাল্কা, পরলে মনে হবে না কিছু পরেছেন। কিন্তু সে-ই তো এ-কাপড়ের কেরামতি।'

'ঠিক কথা', বললে ঘোড়সওয়ারের দল। কিন্তু তারা কিছুই অবিশ্যি দেখতে পেলো না, যেহেতু দেখবার কিছু তো ছিলোই না।

জোচ্চোররা তখন বললে,—'মহারাজ, যদি দয়া ক'রে বস্ত্র-ত্যাগ করেন, বড় আয়নার সামনে নতুন পোষাকটা পরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

মহারাজ তো বস্ত্রত্যাগ করলেন, আর তারা এক-এক ক'রে নতুন পোষাকের বিভিন্ন অংশ তাঁকে পরিয়ে দেবার ভাণ করলে ; মহারাজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে দেখলেন।

'বাঃ, কী চমৎকার দেখাচ্ছে !' জোচ্চোররা একসঙ্গে ব'লে

উঠলো, 'কী চমৎকার মানিয়েছে! নক্সার কী কারুকার্য্য, রঙের কী বাহার! পোষাক হয়েছে বটে একখানা!'

মিছিলের মালেক এসে বললেন, 'মহারাজ, ছত্রধারিরা বাইরে অপেক্ষা করছে, মিছিল এখনই বেরোবে।'

'আমি তো প্রস্তুত। দ্যাখো তো আমাকে ঠিক মানিয়েছে কিনা?' ব'লে রাজা আবার আয়নার দিকে তাকালেন, তাঁর নতুন পোষাক বিশদভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখছেন এমন ভাব করলেন।

বান্দারা নিচু হ'য়ে মেঝেতে হাত রাখলো, তারপর হাত মুঠো ক'রে উ'ঠে দাঁড়ালো, যেন রাজার উড়ুনির লুটিয়ে-পড়া আঁচল ধ'রে রয়েছে। পাছে কেউ লক্ষ্য ক'রে ফেলে যে তারা কিছুই দেখছে না এই ভয়ে তারা অস্থির।

এমনি করে রাজা বেরোলেন মিছিল ক'রে, মাথার উপরে সোনা-রূপোর কাজ-করা মণি-মুক্তোর ঝালর-বসানো রাজছত্র। রাস্তার দু'দিকে যত লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলো সবাই বলাবলি করলে,—'তুলনা হয় না রাজার এই নতুন পোষাকের। কেমন মানিয়েছে একবার দ্যাখো! উড়ুনির আঁচলখানাই বা কী!' এ-কথা কেউই জানতে দিতে চায় না যে সে নিজে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কেননা তা'হলেই প্রমাণ হবে যে হয় সে নিরেট বোকা, নয় তো তার কাজের অযোগ্য সে। এত বাহবা রাজার কোনো পোষাকই কখনো পায়নি।

শেষ পর্য্যন্ত ছোট্ট একটি ছেলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওমা!

তুলনা হয়না রাজার এই নতুন পোষাকের—৫৪ পৃষ্ঠা

রাজা দেখছি কিছুই পরেননি?' রাজা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'শোনো একবার বোকা ছেলেটার কথা!'

কিন্তু কথাটা কানাঘুষোয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আস্তে-আস্তে সবাই বলতে আরম্ভ করলো,—'আমাদের রাজা দেখি কিছুই পরেননি!'

ক্রমে কথাটা রাজার কানে কেমন ঠেকলো। তাঁর মনে লাগলো কথাটা, কেননা তাঁর যেন মনে হ'লো যে কথাটা ঠিক। কিন্তু মনে-মনে তিনি ভাবলেন,—'মিছিল ক'রে বেরিয়েছি যখন, যেতেই হবে মিছিলের সঙ্গে-সঙ্গে।' আর বান্দারা আরো বেশি শক্ত ক'রে মুঠি চেপে ধরলো; আঁচলই নেই, অথচ আঁচল ধ'রে-ধ'রে নিয়ে চললো তারা!

দেশালাইয়ের বাক্স

একটি বড় সহর এদেশ থেকে অনেক, অনেক দূরে পৃথিবীর উত্তরের দেশে, সেখানে দারুণ শীত। সেই দেশের ছোট একটি মেয়ে সহরের পথ দিয়ে চলেছে একদিন বিকেলবেলায়। ভীষণ শীত, ঝুর্‌ঝুর্ ক'রে পড়ছে বরফ, অন্ধকার হ'য়ে আসছে। মেয়েটির মাথায় নেই টুপি, পায়ে নেই জুতো—এদিকে সন্ধ্যা বুঝি হ'য়ে এলো, এ-বছরের শেষ সন্ধ্যা। বাড়ী থেকে যখন সে বেরিয়েছিলো, তখনো কি তার পায়ে জুতো ছিলো না? ছিলো বইকি, কিন্তু কী হবে ও-জুতো দিয়ে? ও যে মস্ত বড়, তার মায়ের পায়ের চটি। অত বড় জুতো কি সামলানো যায়? একবার রাস্তা পার হ'বার সময়—দু'দিক্ থেকে জোর্‌সে হাঁকিয়ে দুটো গাড়ী আসছিলো—মেয়েটি পা-হড়কে প'ড়ে চটিজোড়া হারিয়েছে। একপাটি আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না, অন্য পাটি মস্ত একটা ছেলে কুড়িয়ে তু'লে নিলে। ছেলেটা বুঝি ভাবলো, যখন তার নিজের ছেলেপুলে হবে, এটা দিয়ে সে খেলনা করতে পারবে। ছোট মেয়েটি তাই এখন চলেছে শুধু পায়ে, ঠাণ্ডা লেগে-লেগে ছোট পা দুটি দস্তুরমত নীল হ'য়ে গেছে। কোমরের সঙ্গে বাঁধা থলিতে তার কতকগুলো দেশলাইয়ের বাক্স, হাতে একটা বাণ্ডিল। আজ কেউ তার একটা দেশলাইও কেনেনি, একটা পয়সাও পায়নি সে।

আহা বেচারা—বড় খিদে পেয়েছে তার, শীতে কাঁপছে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে, কত কষ্টে চলেছে সে। বরফ প'ড়ে প'ড়ে লম্বা চুল তার ভ'রে গেলো, কিন্তু এখন চুলের কথা কে ভাবে! রাস্তার দু'ধারে বাড়ীর জানালায়-জানালায় আলো জ্বলছে, ভেসে আসছে রোষ্ট-হাঁসের অপূর্ব্ব গন্ধ। কাল নববর্ষ কিনা। হ্যাঁ, কাল নববর্ষের দিন—সকলের অত ফূর্ত্তি সেইজন্যেই।

রাস্তার মোড়ে কোণাকুণি দুটো বাড়ী, সেখানে মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে ব'সে পড়লো। পা দু'টি সে টেনে তুললো, তবু যেন আরো বেশি শীত করছে। বাড়ী ফিরতে সাহস হয় না তার, একটা দেশলাইও সে বেচতে পারেনি, একটা পয়সাও সে নিয়ে যেতে পারবে না। বাবা তো ধ'রে মারবেন—তা ছাড়া, তাদের বাড়ীর মধ্যেও প্রচণ্ড শীত। ঘরের চালে কত যে ফুটো অন্ত নেই, তার ভিতর দিয়ে হূ-হূ ক'রে ছুরির মত হাওয়া এসে ঢোকে। তবু তো মা খড়-ন্যাকড়া দিয়ে বড় বড় ফুটোগুলো বুজিয়ে দিয়েছেন!

শীতে তার ছোট দুটি হাত প্রায় জ'মে গেছে। ঠিক কথা—একটা দেশলাইয়ের কাঠি বার ক'রে দেওয়ালের সঙ্গে ঘষলেই হয়—তবেই তো সে হাত গরম করতে পারে। তার আঙুল-গুলো হিমে ভারি হ'য়ে বেঁকিয়ে আটকে গেছে, সহজে নড়তে চায় না। আস্তে-আস্তে আঙুলগুলো সে সোজা করলো, তারপর বাণ্ডিল থেকে একটা কাঠি বার ক'রে জ্বালালো। ফ্‌ফ্‌ফ্‌—ভোঁস্‌! দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো আগুন, সুন্দর উজ্জ্বল গরম

আগুন, হাত দিয়ে সে আড়াল করছে। ছোট্ট মোমবাতির মত-ছোট্ট আগুন! সত্যি তখন মেয়েটির মনে হ'লো যেন সে বসে আছে সুন্দর সাজানো একটা ঘরে, ব'সে-ব'সে আগুন পোয়াচ্ছে। জোরে জ্বলছে ঝক্‌ঝকে আগুন—কী আরাম! ঐ যাঃ—গেলো তো ছোট্ট আগুনটুকু নিবে, মিলিয়ে গেলো তার গরম ঘরের আরাম; শুধু ধরা রয়েছে পোড়া কাঠিটা তার আঙুলে।

আর-একটা কাঠি বার ক'রে সে দেয়ালের গায়ে ঘষলো। আলো পড়লো দেয়ালে, তারপর দেয়ালটা যেন আস্তে-আস্তে ঘোমটার মত স্বচ্ছ হ'য়ে এলো, সে দেখতে পেলো ভেতরটা। কী মস্ত ঘর! ঐ যে টেবিলটা ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা, তার ওপর ঝক্‌ঝকে রূপোর থালা-বাসন সাজানো—আর মাঝখানে গোল রূপোর থালায় আস্ত একটা হাঁস, এইমাত্র রোষ্ট ক'রে আন্‌লো, এখনো ধোঁয়া উঠছে, পেটটা আপেল আর শুকনো প্লাম ফলে ঠাসা। তারপর—আরে এ কী! হাঁসটা যে টেবিল থেকে নেমে এলো, থপ্ থপ্ পায়ে চলতে লাগলো মেঝের উপর দিয়ে, তার বুকের দু' ধারে ছুরি আর কাটা বিঁধে রয়েছে। চলতে-চলতে সে এলো ছোট্ট মেয়েটির কাছে—সঙ্গে-সঙ্গে নিবে গেল দেশলাই; তার সামনে শুধু সেই মোঠা স্যাৎসেতে ঠাণ্ডা দেয়াল গ্যাঁট হ'য়ে দাঁড়িয়ে। আর একটা কাঠি জ্বাললে মেয়েটি। সে ব'সে আছে অপরূপ একটা ক্রিসমাস-গাছের নিচে—আর একটা ক্রিসমাস-গাছ সে দেখেছিলো সওদাগরের বাড়ির কাচের

দরজা দিয়ে—কিন্তু এটা তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও সুন্দর! জ্বলছে হাজার মোমবাতি সবুজ ডালে-ডালে—প্রত্যেকটি মোমবাতির গায়ে নানারঙের নানারকমের ছবি-আঁকা—ও-রকম ছবি সে যেন কোন দোকানে দেখেছে। মেয়েটি হাত বাড়ালে তাদের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে কাঠিটা গেলো নিবে। মোমবাতি-গুলো অনেক, অনেক উঁচুতে উঠতে লাগলো যেন। ঐ তো তারা আকাশের তারা হ'য়ে গেছে। একটা খসে পড়লো, আগুনের লম্বা লেজ আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে। 'কে যেন মরলো।' ছোট মেয়েটিকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসতো এক তার বুড়ি ঠাকু'মা, তিনি অনেকদিন মারা গেছেন। তিনি ওকে বলেছিলেন যখনই একটি তারা খসে, তখনই কেউ-না-কেউ মরে। দেয়ালে আর-একটা

সে ব'সে আছে একটা ক্রিসমাস-গাছের নীচে

কাঠি ঘষলো মেয়েটি। উজ্জ্বল আলো হ'য়ে উঠলো, আর সেই আলোয়—এ যে পষ্ট ঠাকু'মা দাঁড়িয়ে, কী সুন্দর তিনি হয়েছেন দেখতে।

'ঠাক্'মা!' মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো। 'নিয়ে যাও, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। তুমি বুঝি এই দেশালাই নিবলেই মিলিয়ে যাবে? কী সুন্দর আগুন দেখলাম, কী মস্ত মোটা হাঁস টকটকে রোষ্ট করা, কেমন আলো-জ্বালানো প্রকাণ্ড ক্রিসমাস-গাছ! ওদের মত তুমিও মিলিয়ে যাবে বুঝি?'

তাড়াতাড়ি একটার পর একটা বাকি সবগুলো কাঠি সে জ্বালাতে লাগলো, ঠাকু'মাকে ধ'রে রাখবার জন্যে। কাঠিগুলো এমন জোরে জ্বালালো যে দুপুরবেলার মত আলো হ'য়ে উঠলো; কখনো সে ছ্যাখেনি তার ঠাকু'মাকে এত বড়, কি এত সুন্দর। ওকে তিনি কোলে তুলে নিলেন, দু'জনে চললো আলোয় আর আনন্দে উ'ড়ে, পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক ওপরে, অনেক দূরে—সেখানে শীত নেই, ক্ষুধা নেই, নেই কোন কষ্ট—গিয়ে মিশলো ঈশ্বরের সঙ্গে।

আর ছোট মেয়েটি দেয়ালে হেলান দিয়ে কোণে ব'সে রইলো, রক্তহীন সাদা তার গাল, ঠোঁটের কোণে তার হাসি, পুরোণো বছরের শেষ সন্ধ্যায় সে জ'মে ম'রে গেছে। নতুন বছরের সূর্য্য উঠলো ছোট্ট একরত্তি মৃতদেহের উপর। দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে সে ব'সে, মূর্ত্তির মত শক্ত আর ঠাণ্ডা একটা বাণ্ডিল পোড়ানো হয়েছে। 'আহা বেচারা, দেশলাই

জ্বালিয়ে গরম হ'তে চেয়েছিলো', লোকে বললে। ওরা কেউ ভাবতেও পারলে না কী সে দেখেছিলো, কী সুন্দর, কী অপূর্ব্ব সুন্দর, কী অপূর্ব্ব আনন্দে, কোন সুদূর দেশে সে চ'লে গিয়েছিলো তার ঠাকু'মার সঙ্গে, বছরের শেষ সন্ধ্যায়!

লাল জুতো

ছিল এক ছোট্ট মেয়ে—যেমন সে দেখতে সুন্দর, তেমনি সে লক্ষ্মী। হ'লে হবে কী, সে বেজায় গরিব। গরমের দিনে তার খালি পা ; আর শীতকালে শক্ত কাঠের জুতো প'রে-প'রে ছোট্ট পা টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে ওঠে।

গ্রামের মধ্যিখানে থাকে এক মুচির বৌ ; লাল রঙের পুরানো কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে সে ব'সে ব'সে ছোট্ট এক জোড়া জুতো তৈরি করলে ; সেলাই তার ভালো হলো না, জুতো জোড়া কেমন বেঢপ্ হ'য়ে ওঠলো—তবুও ভালোই বলতে হবে, কেননা সে-জুতো ছোট্ট মেয়েটির জন্যে। মেয়েটির নাম,—কারেন।

একদিন মেয়েটির মা মারা গেলো। পরের দিনই লাল জুতো জোড়া সে পেয়ে প্রথমবার পরলো। সেদিন তার মায়ের কবর, ও-রকম শোকের মধ্যে জুতো জোড়া কেমন খাপছাড়া দেখালো। কিন্তু বেচারার আর তো জুতো নেই—লাল জুতো পরেই সে চললো মায়ের কফিনের পেছনে-পেছনে।

হঠাৎ সে রাস্তায় এলো মস্ত এক গাড়ী, ভিতরে গিন্নি-ঠাকরুণ ব'সে, অনেক তাঁর বয়েস। ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে তাঁর দয়া হ'লো। পুরুৎকে ডেকে তিনি বললেন,—

'এই মেয়েটিকে আমায় দিয়ে দিন, আমি একে মানুষ করি।'

কারেন ভাবলে ইনি বুঝি তার লাল জুতো দেখে খুসি হ'য়ে তাকে নিতে চাইলেন; কিন্তু ঠাকরুণ বললেন, 'এ কী বদ্ চেহারার জুতো, এক্ষুনি পুড়িয়ে ফেলো।' তারপর কারেনের জন্য ভালো-ভালো সব কাপড়চোপড় এলো, তাকে শেখানো হ'লো লেখাপড়া, শেখানো হ'লো সেলাই। যে তাকে দেখলে সে-ই বললে, 'মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী।' কিন্তু তার আয়না বললে, 'লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি তুমি, তুমি সুন্দর।'

একদিন দেশের রাণী বাইরে বেড়াতে বেরোলেন, সঙ্গে তাঁর ছোট্ট মেয়ে—মেয়েটি অবিশ্যি রাজকন্যা। প্রাসাদের পথে দলে-দলে মেয়েপুরুষের ভিড়, তার মধ্যে কারেনও দাঁড়িয়ে। ছোট্ট রাজকন্যা গাড়ীর জানলায় এসে দাঁড়ালো, যাতে সবাই দেখতে পায়। পরণে তার ধব্‌ধবে সাদা মসলিনের পোষাক। গলায় সেই মুক্তোর মালা, মাথায় সেই তার সোনার মুকুট—পায়ে শুধু তার জুতো চক্‌চকে লাল রঙের মরক্কো চামড়ার—কোথায় লাগে তার কাছে মুচি-বৌর তৈরি সেই জুতো। সত্যি, লাল জুতোর মতো পৃথিবীতে আর কিছুই নেই!

কারেন বড় হ'য়ে উঠলো; তার জন্যে এলো নতুন জামা, নতুন কাপড়—নতুন জুতোও তৈরি করাতে হয়। সহরের সব চেয়ে বড় জুতোওলা নিজের বাড়ীতে নিজের ঘরে তার ছোট্ট পায়ের মাপ নিলে—আর সে কী ঘর! চারদিকে ঝক্‌ঝকে

কাচের আলমারি ভরা কত রকমের চক্‌চকে জুতো। এত সুন্দর ঘরটা, অথচ গিন্নিঠাকরুণের যেন তা চোখেই লাগছে না। আরে—ঐ তো এক জোড়া লাল জুতো, ঠিক রাজকন্যা যে-রকম পরেছিলো—কী সুন্দর! জুতোওলা বললে, 'ও-জোড়া রাজার এক ভাই-ঝির জন্যে তৈরি হয়েছিল—মাপ ঠিক হয়নি।'

গিন্নিঠাকরুণ বললেন, 'নিশ্চয়ই পেটেণ্ট্‌ চামড়া—নয়তো এত চক্‌চক্‌ করে!'

'ইস্‌, কী চক্‌চকে!' বললে কারেন। জুতো জোড়া ঠিক লাগলো তার পায়ে, কেনা হ'লো।

পরের দিন কারেন গির্জ্জায় গেলো তার নতুন জুতো প'রে। এমন লাল জুতো প'রে গির্জ্জেয় যেতে নেই, গিন্নিঠাকরুণ জানলে পরে কক্ষনো তাকে যেতে দিতেন না। কিন্তু তিনি কিনা চোখে ভালো ছ্যাখেন না—রঙটা ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। এদিকে কারেন যখন গির্জ্জেয় ঢুকছে, কবরখানার মূর্ত্তি-গুলো থেকে আরম্ভ ক'রে দেয়ালে পুরুৎঠাকুরদের ছবি, লম্বা কালো জামা পরা পুরুৎগিন্নিরা—সবাই যেন হাঁ ক'রে তার লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে রইলো। আর তার মনেও লাল জুতো ছাড়া আর ভাবনা নেই। পুরুৎঠাকুর কত ভালো-ভালো কথা বলছেন, গম্ভীরস্বরে অর্গ্যান বাজছে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা টাটকা মিষ্টি গলায় গান করছে—কিন্তু কারেনের মনে শুধু তার লাল জুতোরই ভাবনা।

বিকেলবেলায় গিন্নিঠাকরুণের কানে খবরটা পৌঁছলো যে

কারেনের জুতোর রঙ্ ছিলো লাল। তিনি গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন যে কাজটা বেজায় খারাপ হ'য়ে গেছে। এর পরে কারেনকে কালো জুতো প'রেই গির্জ্জেয় যেতে হবে—হোক্ না সে-জুতো ছেঁড়াখোঁড়া পুরোণো।

পরের রবিবার গির্জ্জেয় যাবার সময় কারেন তার কালো জুতোর দিকে তাকালো, তারপর তাকালো লাল জুতোর দিকে, তাকালো আরো একবার—তারপর লাল জুতোই পরলে।

চমৎকার রোদ উঠেছে; মাঠের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথে কারেন চলেছে গিন্নিঠাকরুণের সঙ্গে। পথে বেজায় ধূলো।

গির্জ্জের দরজায় লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো এক খোঁড়া ভিখিরি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। তার দাড়ি কিন্তু সাদা নয়, লালচে ছিটের—না, একেবারেই লাল রঙের। প্রায় মাটি পর্য্যন্ত মাথা নুইয়ে গিন্নিঠাকরুণকে সে বললে,—'আপনার জুতো বুরুশ ক'রে দিই ?'

সঙ্গে-সঙ্গে কারেন তার পা বাড়িয়ে দিলে।

'বাঃ, কী সুন্দর নাচের জুতো', বললে বুড়ো ভিখিরি। 'আঁটো হ'য়ে বসবে নাচের সময়' ব'লে সে জুতার তলায় আঙুল দিয়ে কয়েকবার টোকা দিলে। গিন্নিঠাকরুণ তাকে কিছু ভিক্ষে দিলেন, তারপর কারনকে নিয়ে ঢুকলেন গির্জ্জের মধ্যে।

গির্জ্জের ভেতরে সবাই কারেনের লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে রইলো হাঁ ক'রে; তাকিয়ে রইলো দেয়ালের ছবিগুলো।

সকলের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে ব'সে সে কেবল তার লাল জুতোর কথা ভাবলে,—ভুলে গেলো উপাসনা করতে, ভুলে গেলো স্তোত্র গাইতে।

তারপর সকলে গির্জ্জে থেকে বেরুলো ; গিন্নিঠাকরুণ তাঁর গাড়ীতে উঠলেন। কারেনও গাড়ীতে ওঠবার জন্যে পা তুলেছে এমন সময় সেই বুড়ো ভিখিরি আবার বললে,—

'বাঃ, কী সুন্দর নাচের জুতো !'

তখন আর কারেন নিজেকে সামলাতে পারলে না, সে কয়েকবার পা ফেলে-ফেলে নাচলো। আর একবার যখন নাচতে আরম্ভ করলো, নেচেই চললো তার পা। তার লাল জুতো যেন নিজের গরজে নাচছে, তাকে থামাবার ক্ষমতা কারেনের নেই। নেচে-নেচে সে চ'লে গেলো গির্জ্জে ছাড়িয়ে, কিছুতেই থামতে পারলে না, কোচ্‌ওয়ানকে পিছন-পিছন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধ'রে আনতে হ'লো, তুলে বসাতে হ'লো গাড়ীর মধ্যে। তবু তার পা নেচেই চলেছে ; নাচতে-নাচতে গিন্নি-ঠাকরুণকে সে সাংঘাতিক কয়েকটা লাথি মারলে। শেষ পর্য্যন্ত তার পা থেকে জুতো খুলে নেয়া হ'লো—সঙ্গে-সঙ্গে থামলো নাচ।

বাড়ী গিয়ে গিন্নিঠাকরুণ জুতোজোড়া বাক্সয় তু'লে রাখলেন, কিন্তু কারেনের মাঝে-মাঝে লুকিয়ে তা' দেখা চাই।

তারপর হ'লো কী, গিন্নিঠাকরুণের বেজায় অসুখ করলো—তিনি নাকি আর বাঁচবেন না। তাঁর অনেক সেবা-শুশ্রূষার

দরকার—আর সেটা কারেনের অবিশ্যি সব চেয়ে বেশি করবার কথা। কিন্তু এদিকে মস্ত নাচ হবে সহরে—কারেনের সেখানে নিমন্ত্রণ। গিন্নিঠাকরুণের দিকে সে একবার তাকালে—যাঁর কিনা বাঁচবার আশা নেই—এক বার তাকালো তার লাল জুতোর দিকে, তারপর ভাবলে এতে এমন আর দোষ কী। পরলে সে লাল জুতো—তা' না হয় পরলোই—কিন্তু লাল জুতো প'রে সে গেলো নিমন্ত্রণে, গিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো।

নাচছে তো নাচছে—সে যখন যেতে চায় ডানদিকে জুতো যায় বাঁদিকে ; সে যখন উঠতে চায় উপরতলায়, জুতো নেমে আসে নিচের দিকে, ঘর

ঘন গাছের ফাঁকে কী যেন চক্‌চক্‌ করছে

পার হ'য়ে রাস্তায়, রাস্তা পার হ'য়ে সহরের ফটকে; তারপর সহর পার হ'য়ে নেচে-নেচে সে চ'লে এলো একেবারে অন্ধকার বনের মধ্যে।

উপরে, ঘন গাছের ফাঁকে-ফাঁকে কী যেন একটা চক্‌চক্ করছে। একটা মুখের মত দেখে কারেন প্রথমটায় ভেবেছিলো

নাচেতেই হ'লো ঝোপের ওপর দিয়ে, মাঠের ভেতর দিয়ে

চাঁদ বুঝি। আসলে কিন্তু লাল দাড়িওয়ালা সেই বুড়ো ভিখিরিটা, মাথা নেড়ে-নেড়ে সে বলছে ঃ

'কি সুন্দর নাচের জুতো, ছাখো!"

তখন কারেন ভয় পেয়ে গেলো; খুলে ফেলতে চাইলো তার জুতো, কিন্তু জুতো শক্ত হ'য়ে পায়ে আঁকড়ে রইলো।

সে টেনে ছিঁড়ে ফেললে মোজা, কিন্তু জুতো যেন তার পায়ে শেকড় গজিয়েছে। নাচতে হ'লো তাকে, নাচতেই হ'লো, ঝোপের ওপর দিয়ে, মাঠের ভেতর দিয়ে, যখন বৃষ্টি আর যখন রোদ, যখন দিন আর যখন রাত্রি—কিন্তু রাত্রিতেই সব চেয়ে ভয়ানক।

নাচতে-নাচতে সে গেলো গির্জ্জের কবরখানায়; কিন্তু যারা ম'রে গেছে তারা তো নাচে না, তাদের অনেক ভালো-ভালো কাজ আছে। গরিবদের কবরের উপর উঠেছে ঘন সবুজ ঘাস, সেখানে সে একটু বসতে চাইলো; কিন্তু তার জন্যে শান্তি নেই, নেই বিশ্রাম। নেচে-নেচে সে গেলো গির্জ্জের খোলা দরজার দিকে, সেখানে লম্বা সাদা জামা-পরা এক দেবদূত দাঁড়িয়ে, কাঁধ থেকে পা পর্য্যন্ত তার পাখা, মুখ তার গম্ভীর, হাতে তার ঝক্‌ঝকে চওড়া তলোয়ার।

'নাচবি তুই', দেবদূত বললে, 'নাচবি লাল জুতো প'রে—যতদিন না তুই ফ্যাকাসে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাস্, যতদিন না তোর শরীর শুকিয়ে শুকিয়ে কঙ্কাল হ'য়ে যায়। এ-দরজা থেকে ও-দরজায় তুই নেচে বেড়াবি—আর যে-সব বাড়ীতে দেমাকি ছেলেমেয়েরা থাকে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে তুই ডাকবি, যাতে তারা তোকে দেখে ভয় পায়! নাচ্, নাচ্ তুই, নাচ্।'

'দয়া করো, দয়া করো', কারেন চীৎকার ক'রে উঠলো।

কিন্তু দেবদূত উত্তরে কিছু বললে কিনা সে শুনতে পেলো না—কেননা তার লাল জুতো তাকে নাচিয়ে উড়িয়ে নিয়ে

গেলো—দরজার বাইরে মাঠে, পথের ওপর দিয়ে, পাথরের ওপর দিয়ে—নাচছে সে, কেবলি নাচছে।

একদিন সকালে একটা দরজার পাশ দিয়ে সে নেচে গেলো—সেটা তার চেনা। ভিতর থেকে আসছে স্তোত্রপাঠের শব্দ, ফুল দিয়ে সাজানো একটা কফিন কারা সব বাইরে নিয়ে এলো। তখন সে বুঝতে পারলে যে গিন্নিঠকুরুণ মারা গেছেন। আর তার মনে হ'লো সবাই, সবাই তাকে ছেড়ে গেছে, আর তার উপর স্বর্গের দেবদূতের অভিশাপ।

সে নেচে চললো—নাচতেই হ'লো তাকে—নচলো সে রাত্রির অন্ধকারে। তার লাল জুতো তাকে নিয়ে গেলো ঝোপঝাড় কাঁটাবনের উপর দিয়ে, গা কেটে তার রক্ত বেরুলো, নেচে-নেচে সে গেলো পোড়ো মাঠ পার হ'য়ে, ছোট্ট একলা একটা বাড়ীর কাছে। বাড়ীটা সে চেনে; সেখানে থাকে একজন লোক, রাজার হুকুমে খারাপ লোকদের মাথা কেটে ফেলা তার কাজ।

সে-বাড়ীর জনালার কাছে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে ডাকলে,—'বেরিয়ে এসো, শিগগীর বেরিয়ে এসো। আমি তো ভিতরে ঢুকতে পারবো না, আমাকে নাচতে হচ্ছে।'

লোকটি বললে, 'আমি কে তুমি বোধ হয় জানো না?'

'জানি, জানি। কিন্তু আমার মাথা কেটে ফেলো না, তাহ'লে আমার দোষের জন্য দুঃখ নেবে কে? কেটে ফেলো আমার পা, লাল জুতোসুদ্ধ।'

কারেন তাকে নিজের কথা সব বললে, আর লোকটি কেটে ফেললে তার দুটো পা জুতোসুদ্ধ। কিন্তু লাল দুটি, জুতো ছোট দুটি পা সুদ্ধ নেচে-নেচে উড়ে চ'লে গেলো মাঠের উপর দিয়ে গভীর বনের মধ্যে।

তারপর লোকটি তাকে একজোড়া কাঠের পা তৈরী ক'রে দিলে, দিলে একজোড়া লাঠি, শেখালে স্তোত্র; তারপর কারেন লোকটিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলো পোড়ো মাঠ পার হ'য়ে।

'এখন তো অনেক দুঃখ আমি নিয়েছি,' সে ভাবলে। 'এখন আমি য্যাবো গির্জ্জের মধ্যে, সবাই আমায় দেখুক্।

তাড়াতাড়ি সে গেলো গির্জ্জের দিকে, কিন্তু দরজার কাছে সেই লাল জুতোজোড়া নাচছে! ভয় পেয়ে সে ফি'রে এলো।

সারাটা সপ্তাহ সে কাটালো চুপ্‌চাপ্ মাথা নিচু ক'রে, কত কন্নাই যে কাঁদলো! তারপর রবিবার এলো।

'কম দুঃখ তো পেলাম না—যারা গির্জ্জের মধ্যে গিয়ে মাথা উঁচু ক'রে বসে, তাদের চেয়ে এখন আমি কম কিসে?'

এই ভাবে সে বুক ফুলিয়ে চললো গির্জ্জের দিকে, কিন্তু যেই ফটকের কাছে আসা, অমনি নেচে উঠলো জুতো তার চোখের সামনে। আবার ভয় পেয়ে সে এলো ফিরে।

তখন সে পুরুৎঠাকুরের বাড়ী গিয়ে বললে, 'আমাকে ঝি রাখবে? আমি খুব খাটবো, মাইনে চাইনে এক পয়সাও, শুধু তোমাদের মত ভালো লোকের সঙ্গ পেতে চাই।' পুরুৎ-গিন্নির দয়া হ'লো, তাকে কাজে নিলেন। মুখ বুজে সারাদিন

সে খাটে। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা তার খুব ভক্ত হ'য়ে পড়লো, সন্ধ্যেবেলায় তাদের সঙ্গে সে গল্প করে। কিন্তু যদি কখনো ভালো চেহারা কি ভালো কাপড়চোপড়ের কথা ওঠে, তক্ষুনি সে চুপ ক'রে যায়।

পরের রবিবার বাড়ীর সবাই গির্জ্জেয় গেলো, গিন্নি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও যাবে, কারেন?' কারেনের চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠলো, ম্লানমুখে সে তাকিয়ে রইলো তার কাঠের পায়ের দিকে। সবাই চ'লে গেলো, সে গিয়ে ঢুকলো তার ছোট্ট ঘরটিতে—সেখানে শুধু একটি বিছানা আর একটি চেয়ার। একা সে ব'সে রইলো চুপ ক'রে, বাতাসে ভেসে এলো গির্জ্জের অর্গ্যানের শব্দ, চোখ দিয়ে দরদর ক'রে তার জল পড়তে লাগলো। ভিজে মুখখানি উপরের দিকে তু'লে সে বললে,—'ঈশ্বর, আমায় দয়া করো, দয়া চাই তোমার।'

তারপর সূর্য্য যেন আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, আর তার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই দেবদূত, সাদা জামা পরা—কিন্তু এখন আর নেই তার হাতে সেই ধারালো তলোয়ার। এখন তার হাতে সবুজ একটি ডাল, তাতে অনেক গোলাপ ফু'টে রয়েছে। সে এসে ঘরের কড়িকাঠে হাত রাখলো, সঙ্গে সঙ্গে ছাদটা অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে গেলো, আর যেখানেই সে ছোঁয় সেখানেই একটি সোনালি তারা জ্ব'লে ওঠে; সে হাত রাখলো দেয়ালে, আর দেয়ালগুলো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দূরে মিলিয়ে গেলো, কারেন দেখতে পেলো গির্জ্জের ভিতরটার সেই সব

পুরুৎ আর পুরুৎগিন্নিদের ছবি, আর গির্জ্জের মধ্যে সবাই হাঁটু গেড়ে ব'সে গান গাইছে। তার এই ঘরটি ছোট্ট গির্জ্জে, হ'য়ে উঠলো যে—বাড়ীর সকলের সঙ্গে যেন সে ব'সে আছে—ঐ তো পুরুৎঠাকুর, আর পুরুৎগিন্নি গান শেষ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বলছেন,—

'ভালো করেছো এখানে এসে, কারেন !'

'ঈশ্বরের দয়া,' কারেন বললে।

আর অর্গ্যানে আশ্চর্য্য গম্ভীর বাজনা বেজে উঠলো, আর মধুর হ'য়ে বেজে উঠলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমল কণ্ঠস্বর ; কী মধুর রোদ জানলা দিয়ে তার চেয়ারের গায়ে গড়িয়ে এসে পড়েছে ; তার হৃদয় ভ'রে গেলো সূর্য্যের সোনালি কিরণে আর শান্তিতে আর আনন্দে—যেন আনন্দের চাপে তার বুক ভেঙে যাবে। তারপর সূর্য্যের আলোর পাখায় সে উড়ে চ'লে গেলো স্বর্গে—সেখানে কেউ তার লাল জুতোর কথা জিজ্ঞেস করলে না।

ছোট কালু ও বড় কালু

এক গ্রামে ছিলো দু'জন লোক, দু'জনেরই এক নাম—দু'জনেরই নাম কালু; কিন্তু একজনের ছিলো চারটে ঘোড়া, আর-একজনের শুধু একটা। চারটে ঘোড়া যার, গ্রামের লোক তাকে বলতো বড় কালু· আর যার একটা ঘোড়া তাকে বলতো ছোট কালু। এখন গল্পটা মন দিয়ে শোনো, কেননা গল্পটা সত্যি।

সপ্তাহের ছ'দিন ছোট কালু বড় কালুর জন্যে লাঙল ঠেলে-ঠেলে খেটে মরতো, আর তার একটিমাত্র ঘোড়া তাকে ধার দিতো; তারপর বড় কালু ছোট কালুকে তার চারটে ঘোড়াই ধার দিতো, কিন্তু সে শুধু একদিন, রবিবারের দিন। হুর্‌র্‌! কী ফূর্তি তার সেদিন! পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়ার গায়ে মনের সুখে সে চাবুক চালাতো, সেদিনকার মত তো পাঁচটা ঘোড়াই তার। ফুর্তিসে রোদ চড়ছে সকালবেলায়, গ্রামের ছেলে-বুড়ো পোষাকি কাপড় প'রে হাটের দিকে যেতে-যেতে ছাখে ছোট কালু পাঁচ ঘোড়া নিয়ে তার ক্ষেত চাষ করছে; কিন্তু তার মনে এত ফূর্তি যে সে থেকে-থেকে ঘোড়াদের গায়ে ক'ষে চাবুক চালাচ্ছে আর হেঁকে উঠছে, 'সাবাস্‌! আমার পাঁচ ঘোড়া, সাবাস্‌!

বড় কালু বললে, 'ও-রকম কথা বলতে পারবে না, সাবধান। মোটে তো একটা ঘোড়া তোমার।'

কিন্তু পথ দিয়ে কেউ যখন যাচ্ছে না, ছোট কালু সব সাবধান ভু'লে গিয়ে আবার হেঁকে উঠলো, 'সাবাস্! আমার পাঁচ ঘোড়া, সাবাস্!'

বড় কালু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'ও-রকম কথা আর বলবে না, বুঝলে? ফের যদি তোমার মুখে ও-কথা শুনি তোমার ঐ ঘোড়ার মাথায় এক বাড়ি দিয়ে একদম ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। বুঝলে?'

'আর কখনো ও-রকম বলবো না,' বললে ছোট কালু।

বললে হবে কী—যেই না দু'চারজন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বলছে, 'কী ছোট কালু, কেমন আছো।' অমনি তার মনে এমন ফূর্তি হ'লো যে সে ভাবলো—'তাই তো! খাসা দেখাচ্ছে আমায়, পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে চাষ করছি! আর অমনি ক'ষে চাবুক মেরে সে হেঁকে উঠলো, 'সাবাস্! আমার পাঁচ ঘোড়া, সাবাস্!'

'রোসো, বার করছি তোমার সাবাস্টা!' বলতে-বলতে বড় কালু মস্ত একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে ছোট কালুর একটিমাত্র ঘোড়ার মাথায় এমন মারই মারলে যে ঘোড়াটা সেই যে চিৎ হ'য়ে মাটিতে পড়লো, আর উঠলো না।

'ওমা! এখন তো আমার একটা ঘোড়াও রইলো না', ব'লে ছোট কালু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কান্না শেষ হ'লে সে ঘোড়াটার চামড়া ছাড়িয়ে নিলে, রোদে হাওয়ায় সেটা [illegible], শুকনো হ'লে ভ'রলো একটা থলিতে,

তারপর থলিটা কাঁধে ফেলে চললো সহরের দিকে ঘোড়ার চামড়া বেচতে।

সহর অনেক দূরের রাস্তা, ছোট কালুকে যেতে হ'লো মস্ত ঘন একটা বনের ভেতর দিয়ে। এদিকে ভীষণ ঝড়-বাদ্‌লা ক'রে এলো, অন্ধকারে সে পথ হারিয়ে ফেললো। ঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেতে-না-পেতেই সন্ধ্যে হ'য়ে এলো—এদিকে সে এত দূরে চ'লে এসেছে যে বাড়ী ফেরবার উপায় নেই তার, রাত পড়বার আগে সহরে পৌঁছনোও যাবে না।

পথের পাশেই বেশ বড়-সড় একটা বাড়ী—কোনো সওদাগরের হবে। জানলাগুলো বন্ধ, কিন্তু খড়খড়ির ফুটো দিয়ে আলোর ফিন্‌কি দেখা যাচ্ছে।

'এখানেই রাতটা কাটাতে পারি কিনা দেখি', মনে-মনে এই ভেবে ছোট কালু দরজায় টোকা দিলে।

দরজা খু'লে দিলে সওদাগরের বৌ। কিন্তু ছোট কালুর কথা শু'নে সে বললে, 'না, না, ও-সমস্ত হবে না, এখান থেকে যাও। আমার স্বামী বাড়ী নেই, অচেনা একটা লোককে আমি বাড়ীতে থাকতে দিতে পারবো না।'

'তাহ'লে আমি বাইরেই শোবো,' ছোট কালু বললে। সওদাগরের বৌ কোনো জবাব না দিয়ে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

ছোট কালু আর কী করে, হাঁ ক'রে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাড়ীটার শণের চাল, খুব ঢালু হ'য়ে

অনেকখানি নেমে এসেছে। 'বাঃ!' ছোট কালু নিজের মনে বললে, 'ওখানেই তো আমি শুতে পারি, ঐ তো চমৎকার বিছানা। এখন ঐ সারসটা উড়ে এসে আমার পায়ে কামড়ে না দিলেই হয়।' কেননা চালের উপরের দিকে একটা সারস লম্বা ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে, সেখানে বাসা বেঁধেছে।

একটা গাছের ডাল ধ'রে পা বাড়িয়ে ছোট কালু উঠলো তো চালের ওপর। সেখানে এপাশ-ওপাশ ক'রে মোটে সে একটু আরাম ক'রে নিচ্ছে, এমন সময় তার চোখে আলো লাগলো। নিচের দিকে তাকিয়ে সে ছ্যাখে—ওমা! ঘরের উপরের দিকে ছোট একটা জানালা খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে পষ্ট সে ভিতরটা সব দেখতে পাচ্ছে। মস্ত এক টেবিল, তার ওপর ধব্‌ধবে সাদা কাপড়—আর কত কী ভালো-ভালো খাবার সাজানো, মাছ, মাংস, মিষ্টি কত কী। সেখানে ব'সে আছে সওদাগরের বৌ আর এক পুরুৎঠাকুর—আর কেউ নয়। পুরুৎঠাকুর ঘাড় কাৎ ক'রে মাছের মুড়ো চিবোচ্ছেন—মাছের মুড়ো পেলে তিনি আর কিছু চান না।

'আহা রে, আমি যদি একটু পেতাম!' ব'লে ছোট কালু ছোট জানলাটার দিকে মাথা বাড়ালো। 'ইস্—কী সুন্দর একটা কেক, দেখতেও প্রাণ ঠাণ্ডা। হ্যাঁ—ভোজ হচ্ছে বটে একটা।'

কিসের একটা শব্দ শু'নে ছোট কালু কান খাড়া করলো। বড় রাস্তা দিয়ে কে আসছে ঘোড়ায় চ'ড়ে—সওদাগর বাড়ী ফিরছে। সওদাগর লোকটি এমনিতে মন্দ নয়, কিন্তু ঐ তার

এক পাগলামি যে পুরুৎ জাতটাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তার চোখে কোনো পুরুৎ পড়েছে কি সে একেবারে ক্ষেপে যাবে। পুরুৎঠাকুর তাই ও-বাড়ীতে এমন সময়েই যান, কর্ত্তা যখন বাড়ী থাকেন না; আর গিন্নিঠাকরুণ যত পারেন ভালো-ভালো জিনিস খাইয়ে তাঁকে খুসি করেন।

এখন হয়েছে কী, পুরুৎঠাকুর সবে মাছের মুড়োটাকে গুঁড়ো ক'রে এনেছেন, এমন সময় সওদাগরের ঘোড়ার শব্দ শোনা গেলো। তাই তো, বড় মুস্কিল। গিন্নি বললেন, 'আপনি চট্ ক'রে ঐ বড় সিন্ধুকটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন তো।'

কী আর করা যায়! ঢুকতেই হ'লো পুরুৎঠাকুরকে সিন্ধুকটার মধ্যে, কেননা তিনি তো জানেন যে পুরুৎ চোখে পড়লেই সওদাগর ক্ষেপে যায়। আর গিন্নি যত ভালো-ভালো মাছ মাংস মিষ্টি তাড়াতাড়ি উনুনটার মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন, কেননা স্বামী এ-সব দেখলে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কাকে খওয়ানো হচ্ছিলো।

ছোট কালু যখন দেখলে, ভালো-ভালো খাবার সব সরিয়ে ফেলা হ'লো, সে মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—'ওঃ।'

'উপরে কে? সওদাগর জিজ্ঞেস করলে। আর উপর দিকে তাকিয়ে সে ছোট কালুকে দেখতে পেলো। 'কে তুমি ওখানে? ভালো চাও তো এসো নেমে।'

ছোট কালু তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, 'দেখুন, আমি এই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি—এ-বাড়ীতে রাতটা কাটাবো ভেবেছিলুম।'

'তা বেশ তো,' সওদাগর বললে। 'কিন্তু আগে কিছু খেতে হবে—কী বলো।'

সওদাগরের বৌ এমন ভাব দেখালে যেন ছোট কালুকে দেখে সে কতই খুসি। দু'জনকে টেবিলে বসিয়ে সে তাদের সামনে রাখলে এক থালা সুজির পায়েস। সওদাগরের খিদে পেয়েছিলো, ঐ সুজিই সে দিব্যি খেতে লাগলো। কিন্তু ছোট কালু তো জানে কত সব চমৎকার মাছ-মাংস উনুনের মধ্যে লুকোনো, তার মুখে অন্য-কিছু রুচবে কেন? টেবিলের নিচে তার পায়ের কাছে ছিলো সেই চামড়া-ভরা থলিটা—মনে আছে তো, ঘোড়ার চামড়া বেচতেই সে রওনা হয়েছিলো। এখন সে করলে কী, থলিটাকে এমন জোরে মাড়িয়ে দিলে যে ভিতরে শুকনো চামড়াটা কড়্ কড়্ শব্দ ক'রে উঠলো।

'আরে।' সওদাগর বলে উঠলো। 'কী আছে তোমার থলিটার মধ্যে?'

'ও—ও একটা জিন'—ছোট কালু বললে। 'ও বলছে আমরা যেন আর সুজির পায়েস না খাই—সে জাদু ক'রে উনুনের মধ্যে অনেক মাছ মাংস মিষ্টি এনে রেখেছে।'

'বাঃ।' সওদাগর লাফিয়ে উঠলো। উনুনের ভিতর থেকে সে টেনে বার করলে কত মাছ, কত মাংস, কত মিষ্টি—যা-কিছু তার স্ত্রী লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সে অবিশ্যি ভাবলে এ-সমস্ত জিনের জাদু। তার স্ত্রী কিছু বলতে সাহস পেলো না—চুপ ক'রে ও-সমস্ত খাবার তাদের সামনে এনে রাখলো; আর

দু'জনে মিলে তারা খেলো মাছ, খেলো মাংস, খেলো মিষ্টি—এমন কি সেই সুন্দর কেকটাও খেলো।

খেয়ে-দেয়ে সওদাগরের ভারি ফুর্ত্তি হ'লো। সে ভাবলে ছোট কালুর থলির মধ্যে যে-জিন আছে, ও-রকম একজনের দেখা পেলে বেশ মজা হয়।

'ওহে,' ছোট কালুকে একটা ঠেলা দিয়ে সে বললে, 'আমার একটা খোক্কস দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। তোমার জিন জাদু ক'রে একটা খোক্কস ডেকে আনতে পারে কি?'

'তা' আর পারে না!' ছোট কালু তাড়াতাড়ি বললে। 'আমার জিনকে যা' আমি বলবো তা-ই সে করবে—তা-ই নয় হে?' ব'লে সে চামড়াটার উপর এক লাথি মারলো, সঙ্গে-সঙ্গে সেইটে ক্যাঁ-কোঁ ক'রে উঠলো। 'ও বলছে—নিশ্চয়ই। কিন্তু খোক্কসটা দেখতে বড় বিকট—আপনি বরং ওকে না-ইবা দেখলেন।'

'ও-হো! ভয় পাবার মত লোকই নই আমি। আচ্ছা, কী-রকম ওটা দেখতে হবে, বলো তো?'

'হুবহু যেন একটি পুরুৎঠাকুর।'

'ওঃ হো!' সওদাগর চেঁচিয়ে উঠলো। 'বিকট! বিকট! পুরুৎদের দেখলেই আমার মাথা গরম হ'য়ে যায়, জানো তো! কিন্তু তাতে কী? তাতে কী? সত্যি-সত্যি তো আর পুরুৎ নয়, আসলে তো খোক্কস—অনায়াসে তাকিয়ে দেখতে পারবো। আমার সাহস নেই ভেবো না, কিন্তু দেখো—ওটা যেন আমার কাছে এসে না পড়ে।'

'দেখি আমার জিনকে জিজ্ঞেস ক'রে, এই ব'লে ছোট কালু থলেটা পা দিয়ে চেপে ধ'রে মাথা নিচু ক'রে কান বাড়িয়ে দিলে।

'কী বলছে?'

'বলছে যে ঐ বড় সিন্ধুকটার ডালা খুললেই তার মধ্যে খোক্ষস জড়োসড়ো হ'য়ে বসে' আছে দেখতে পাবেন—কিন্তু দেখবেন যেন—পিছলে পালিয়ে না যায়।'

'তুমি আমার সঙ্গে এসে ধরবে তো?' ব'লে সওদাগর সিন্ধুকের কাছে গেলো; তার মধ্যে অবিশ্যি জ্যান্ত পুরুৎঠাকুরই ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে আছেন। সওদাগর ডালাটা আস্তে একটুখানি তুলে নিচু হ'য়ে একবার উঁকি মারলো।

'উঃ!' এক ঝটকায় সে পিছনে স'রে গেলো। 'হ্যাঁ—সত্যিই তো, ঠিক আমি দেখেছি ওটাকে, হুবহু আমাদের পুরুৎটার মত দেখতে। উঃ, কী সাংঘাতিক!'

এর পর অবিশ্যি আর-এক প্রস্থ খাওয়া না-হ'লে চলে না। খেতে-খেতে, গল্প করতে-করতে অনেক রাত হ'য়ে গেলো।

'তোমার ঐ জিনকে বেচবে আমার কাছে?' সওদাগর বললে। 'যত টাকা চাও দেবো। এক ঘড়া মোহর চাও তা-ও দেবো।'

ছোট কালু ব্যাকুলভাবে বললে, 'না, না, জিনকে বেচী কী ক'রে? কত কাজে ও লাগে ভাবুন না!'

'দাও না, দাও না আমাকে', অনেক কাকুতি-মিনতি করলে সওদাগর।
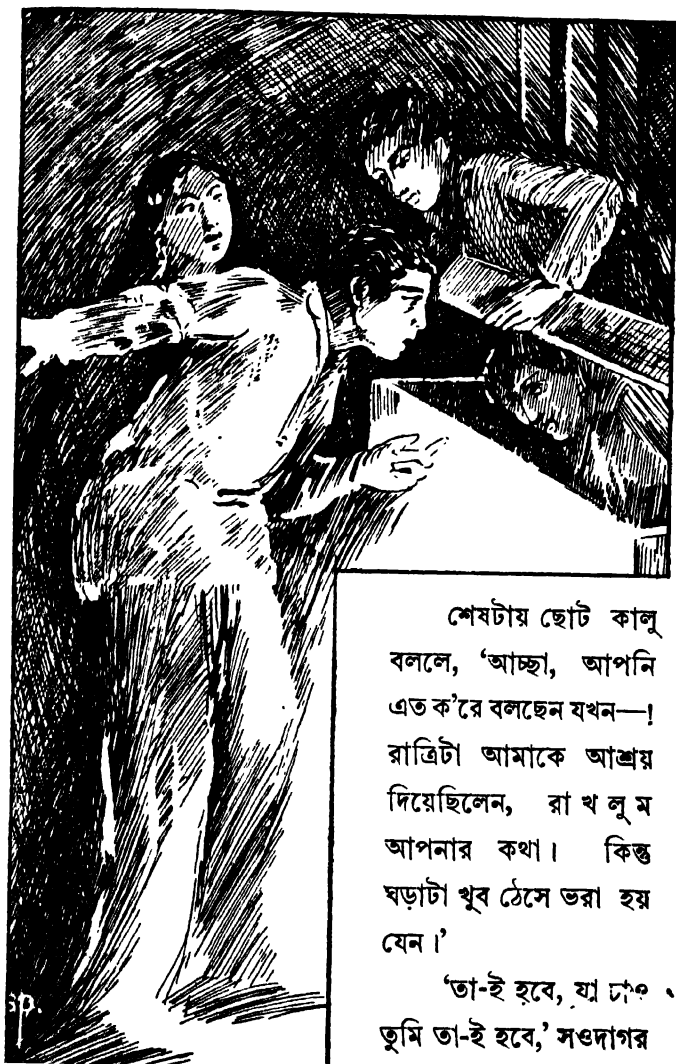
শেষটায় ছোট কালু বললে, 'আচ্ছা, আপনি এত ক'রে বলছেন যখন—! রাত্রিটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, রাখলুম আপনার কথা। কিন্তু ঘড়াটা খুব ঠেসে ভরা হয় যেন।'

'তা-ই হবে, যা চাও, তুমি তা-ই হবে,' সওদাগর

তৎক্ষণাৎ বললে। 'কিন্তু একটা কথা। ঐ সিন্ধুকটা তোমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। ও-আপদ আমি আর বাড়ীতে রাখবো না। ওটা এখনো হয়-তো ওখানে আছে—কে জানে!'

ছোট কালু সওদাগরকে দিলে তার ঘোড়ার চামড়া-ভরা থলি, আর নিলে তার বদলে এক ঘড়া মোহর, তাও ঠেসে-ঠেসে ভরা। সওদাগর তাকে দিলে মস্ত একটা ঝোলা—তার মধ্যে মোহরগুলো আর সিন্ধুকটা ভ'রে নিতে পারবে।

'আচ্ছা, আসি তবে এখন। নমস্কার', ব'লে ছোট কালু ঝোলা কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সিন্ধুকের মধ্যে তখনো পুরুৎঠাকুর ব'সে।

বনের অন্য ধারে প্রকাণ্ড গভীর এক নদী। এমন জলের তোড় যে সেখানে সাঁৎরায় কার সাধ্যি! চমৎকার একটা নতুন সাঁকো উঠেছে নদীর ওপর। সাঁকোর মাঝখানে এসে ছোট কালু থামলো, তারপর বললে—বেশ চেঁচিয়েই বললে, যাতে পুরুৎঠাকুর শুনতে পায়।

'উঃ, খামাকা কেন এই বিদঘুটে সিন্ধুকটাকে ব'য়ে বেড়াচ্ছি! এমন ভারি—ভিতরে যেন পাথর-ভরা! এটাকে কষ্ট ক'রে আর টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? দিই না এটা নদীর মধ্যে ফেলে—সাঁৎরে আমার কাছে ফিরে আসে তো ভালো, আর না আসে তো—নাই বা এলো।'

বলতে বলতে সে সিন্ধুকটা দু'হাতে একটুখানি তু'লে ধরলো যেন নদীর মধ্যে দেবে ফেলে।

'আরে করো কী! করো কী!' ভিতর থেকে পুরুৎঠাকুর প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাকে আগে বেরোতে দাও।'

'ও বাবা!' ছোট কালু এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলো যেন কতোই না ভয় পেয়েছে। 'এখনো ওটা আছে যে! মাঃ, এক্ষুনি এটাকে জলে ফেলে দিতে হবে—ডুবে মরুক্ বেটা খোক্কস।'

'না, না!' পুরুৎঠাকুর আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'শুনছো—আমায় বেরোতে দাও, এক ঘড়া মোহর দেবো তোমাকে।'

'তাহ'লে অবিশ্যি আলাদা কথা', ব'লে ছোট কালু সিন্ধুকটি খুললো।

পুরুৎঠাকুর হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন; খালি সিন্ধুকটা ঠে'লে ফে'লে দিলেন জলে। তারপর বাড়ী গিয়ে ছোট কালুর জন্য নিয়ে এলেন এক ঘড়া মোহর। সওদাগরের কাছ থেকেও এক ঘড়া সে পেয়েছিলো—এখন তার সমস্তটা ঝোলা মোহরেই ভরা।

বাড়ী ফি'রে এসে মেঝের উপর মোহরগুলো ভুর ক'রে ঢালতে-ঢালতে সে ভাবলে, 'যাক্, ঘোড়াটার দাম মন্দ উস্থুল হয়নি একরকম। বড় কালু একবার যদি শোনে একটা ঘোড়া দিয়ে কত বড়লোক হয়েছি আমি, তাহ'লে তো তেড়ে মারতে আসবে এক্ষুনি। ওকে কিছু বলবো না।'

তাই সে বড় কালুর কাছে চাকর পাঠালো একটা পাল্লা চেয়ে আনতে।

'পাল্লা দিয়ে আবার কী করবে?' বড় কালু একটু অবাক

হ'য়ে ভাবলে। আর পাল্লার নিচে সে খানিকটা আলকাৎরা লেপে দিলে। ঠিক! পাল্লাটা ফেরৎ এলো, তার নিচে আটকে রয়েছে তিন-তিনটে চক্‌চকে সোনার মোহর!

'এ কী! এ কী!' তক্ষুনি ছুটলো বড় কালু ছোট কালুর কাছে। 'কোথায় পেলি তুই এত টাকা?'

ছোট কালু উত্তরে বললে, 'ও, এ আমার ঘোড়ার চামড়া বেচে পেয়েছি।'

'ভালো দাম পেয়েছো সত্যি!' বড় কালু হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ী ফিরে এলো; তু'লে নিলে কুড়োল, চার কোপে চারটে ঘোড়াকে সাবাড় করলে; তারপর তাদের ছাড়িয়ে চামড়াগুলো নিয়ে গেলো সহরে বেচতে।

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া! কে নেবে ভালো ঘোড়ার চামড়া!' সহরে সে হেঁকে বেড়ালো।

মুচিরা সব তার হাঁক শুনে দৌড়ে এলো, জিজ্ঞেস করলে, 'কত দাম?'

'এক-একটার জন্যে এক-এক ঘড়া মোহর,' বড় কালু বললে।

'লোকটা পাগল নাকি?' সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। 'এক ঘড়া মোহর কাকে বলে জানো হে?'

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া!' বড় কালু আবার হাঁকতে লাগলো—আর যে-ই দাম শুধোয়, তাকেই বলে, 'এক ঘড়া মোহর।'

'লোকটা আমাদের বোকা বানাতে চায় নাকি ?' সবাই বলাবলি করলে। তারপর মুচিরা জোট বেঁধে লম্বা পাকানো চামড়া দিয়ে তাকে এমন মারতে আরম্ভ করলে যাকে বলে মার।

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া!' তারা ভেংচিয়ে বলতে লাগলো। 'এই ছাখো না, তোমার চামড়াকে কেমন আচ্ছা ক'রে ট্যান ক'রে দিয়েছি। দূর ক'রে দাও এটাকে সহর থেকে।' আর বড় কালু অবিশ্যি যত তাড়াতাড়ি পারলো চম্পট দিলো— এমন মার সে জীবনে কখনো খায়নি।

'তবে রে!' বাড়ী ফিরে গিয়ে সে বললে। 'শোধ তুলবো, ছোট কালুর উপর এর শোধ তুলবো আমি। ওকে খুন করবো, তবে ছাড়বো।'

এদিকে হয়েছে কী, ছোট কালুর বুড়ো ঠান্‌দি মারা গেছে। বুড়ি ছিলো বেজায় বদ্‌মেজাজি, দিন-রাত তাকে জ্বালাতন করতো —তবু সে ম'রে যাওয়ায় ছোট কালুর ভারি খারাপ লাগছিলো। বুড়িকে নিয়ে সে শোয়ালো নিজের বিছানায়—কে জানে এখনো যদি বেঁচে ওঠে। সে ঠিক ক'রে রেখেছিলো বুড়ি সমস্ত রাত তার বিছানাতেই শোবে, আর সে নিজে ঘুমোবে ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ব'সে—এ রকম সে আগেও অনেক করেছে। সে তো ব'সে আছে চেয়ারে, এদিকে অনেক রাত্রে ঘরের দরজা খুলে গেলো, ঢুকলো বড় কালু কুড়োল হাতে। ছোট কালুর বিছানা কোথায় সে জানতো; সোজা বিছানায়

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট কালু মনে ক'রে সেই বুড়ি ঠান্‌দির মাথায়ই এক ঘা দিলে বসিয়ে।

'কেমন! আর কখনো আমাকে জব্দ করবি!' ব'লে কালু বাড়ী চ'লে গেলো।

'লোকটা তো ভারি বদ দেখছি,' ছোট কালু মনে-মনে বললে। 'ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো। ভাগ্যিস বুড়ো ঠান্‌দি আগেই ম'রে গিছ্‌লেন—নয় তো ও তাঁকেই শেষ ক'রে যেতো ঠিক।'

তারপর সে করলো কী, ঠান্‌দিকে পরালো খুব ভালো পোষাক, ধার করলে একটা ঘোড়া, জুড়লো ঘোড়াটাকে একটা গাড়ীর সঙ্গে, তারপর গাড়ীর পিছনের দিকে ঠান্‌দিকে শক্ত ক'রে বসালো যাতে চলবার সময় হুমড়ি খেয়ে সে প'ড়ে না যায়। এমনি ক'রে চললো তারা বনের ভেতর দিয়ে। সূর্য্য যখন উঠলো, তখন তারা একটা সরাইখানার সামনে। ছোট কালু গাড়ী থামিয়ে ভিতরে গেলো কিছু খাবে ব'লে।

সরাইওলার অনেক, অনেক টাকা, তাহ'লেও সে লোক ভালো। কিন্তু মেজাজটা তার বড্ড চড়া, যেন লঙ্কা আর তামাক দিয়ে সে তৈরি।

'এই যে', সরাইওলা বললে। 'আজ যে এত পোষাকের ঘটা?'

'এই—একটু সহরের দিকে যাচ্ছি কিনা', ছোট কালু জবাব দিলে। 'ঠান্‌দি আছেন সঙ্গে। তাঁকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে

এসেছি—কিছুতেই নামবেন না। তা' এক গ্লাস জল দিয়ে আসুন না ঠান্‌দিকে। চেঁচিয়ে কথা বলবেন কিন্তু—বুড়ি আবার কানে খাটো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমাকে কিছু বলতে হবে না,' ব'লে সারাইওলা এক গ্লাস জল নিয়ে গেলো বাইরে। গাড়ীতে ঠেস্ দিয়ে ঠান্‌দি ব'সে আছেন, যেন দিব্যি ভালোমানুষ।

সারাইওলা প্রথমটায় খুব মিষ্টি ক'রেই বললে,—'এই যে, আপনার জন্যে এক গ্লাশ জল এনেছি।' কিন্তু বুড়ি না একটু নড়লো, না কিছু বললো। সারাইওলা তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'শুনছেন? এক গ্লাশ জল এনেছি যে আপনার জন্যে।'

আরো একবার সরাইওলা ও-কথা ব'লে চ্যাঁচালো, কিন্তু বুড়ি যেন জেদ করেছে, শুনবেই না। শেষটায় সরাইওলা গেলো চ'টে, মারলো গেলাসটা ছুঁড়ে বুড়ির মুখে। সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি তো চিৎপটাং।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলো ছোট কালু।—'এ কী! এ কী সর্ব্বনাশ করেছো তুমি! আমার ঠান্‌দিকে মেরে ফেলেছো যে! দ্যাখো, কপালটা কতখানি গর্ত্ত হ'য়ে গেছে।' বলতে-বলতে সে সরাইওলার জামাটা হাত দিয়ে ধরলো চেপে।

সরাইওলা হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, 'তাই তো! তাই তো! ভালো বিপদেই পড়া গেছে। আমার এই বিশ্রী মেজাজই আমাকে একদিন পথে বসাবে। লক্ষ্মী ভাই ছোট কালু, তোমাকে এক ঘড়া মোহর দিচ্ছি—নিয়ে বাড়ী চ'

যাও। উনি তো আমারও ঠান্‌দিরই মত—সৎটার-টৎকার আমিই করাবো। কাউকে কিছু বোলো না ভাই—তাহ'লে আমার মাথাটাই হয়-তো কেটে ফেলবে—ভাবতেই বিশ্রী লাগে, উঃ!'

এমনি ক'রে ছোট কালু আরো এক ঘড়া মোহর পেলো, ঠান্‌দির সৎকারের খরচ এক পয়সাও লাগলো না। আর বাড়ী ফি'রে এসেই সে চাকরকে পাঠালে বড় কালুর কাছে পাল্লা চেয়ে আনতে।

বড় কালুর তো চক্ষুস্থির।—'উঃ? এ আবার কী? এই না আমি ওকে মেরে এলুম! নাঃ, ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে আসতে হচ্ছে।' এই ভেবে সে নিজেই পাল্লা নিয়ে ছোট কালুর বাড়ী গেলো।

অতগুলো মোহর দেখে বড় কালু তো হাঁ।—'বল্‌, বল্‌ শিগ্‌গির, কোথায় পেলি এত টাকা?'

ছোট কালু বললে, 'ভাই, তুমি আমার যা উপকার করেছো বলবার নয়। তুমি তো ঠান্‌দিকে মেরে রেখে গেলে—তারপর ছাখো, ঠান্‌দিকে বেচে কত টাকা পেয়েছি।'

'সত্যি, সত্যিই তো ভালো দাম পেয়েছো,' বললে বড় কালু। তক্ষুনি সে ছুটলো বাড়ী, তু'লে নিলে কুড়োল, এক কোপে শেষ করলে তার নিজের ঠান্‌দিকে। তারপর ঠান্‌দিকে একটা গাড়ীতে বসিয়ে সহরে গেলো এক ডাক্তারের কাছে,—জিজ্ঞেস করলে, 'মড়া কিনবেন?'

'কার মড়া ? তুমি কোথায় পেলে ?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে।

'আমারই ঠান্‌দি,' বললে বড় কালু।' আমি মেরে এনেছি—এক ঘড়া মোহর পেলেই বেচি।'

'কী সর্ব্বনাশ !' ডাক্তার আৎকে উঠলো। 'পাগল নাকি তুমি ? এমন কথা কাউকে আর বোলো না—তাহ'লে কাঁধে তোমার মাথা থাকবে না।' ডাক্তার বড় কালুকে অনেক বুঝিয়ে বললে কাজটা তার কত খারাপ হয়েছে, ভয়ানক লোক না-হ'লে এ-রকম কেউ করে না—আর এর জন্য তার ফাঁসি হওয়াই উচিত। সব শুনে বড় কালুর পিলে চমকালো—এক লাফে সে উঠে বসলো গাড়ীতে, ঘোড়া ছুটিয়ে ভোঁ দৌড় দিলে বাড়ীর দিকে। লোকেরা তাকে পাগল মনে করে ছেড়ে দিলে।

'শোধ নেবো, এর শোধ নেবো,' একবার বড়রাস্তায় প'ড়ে বড়-বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে বড় কালু বললে। 'এই তোমায় ব'লে রাখলাম ছোট কালু, এর শোধ যদি না নিয়েছি'—এই ব'লে সে ভয়ঙ্কর একটা শপথ করলে।

বাড়ীতে পা দিয়েই আর কথা নেই—মস্ত একটা ছালা বগলে ক'রে সে ছোট কালুর কাছে গিয়ে হাজির !—'আর একবার আমায় বোকা বানালি তুই! সে'বার মারলুম চার-চারটে জলজ্যান্ত ঘোড়া, এবার মারলুম বুড়ি ঠান্‌দিকে। বার-বারই চালাকি পেয়েছিস, না ? জন্মের মত তোকে ঠাণ্ডা করছি, আয়—এখন কার সঙ্গে ঠক্‌বাজি করিস্, দেখবো।'

এই না ব'লে সে করলে কী, ছোট কালুকে ধরলে দু'হাতে চেপে, তাকে ভরলো একদম ছালার মধ্যে, তারপর মুখটা শক্ত ক'রে বেঁধে ছালাটা ঘাড়ে ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

'এই চললুম তোকে নদীর মধ্যে ফেলতে।'

নদী অনেক দূরে, ছোট কালু এমন-কিছু হাল্‌কা নয়। খানিকদূরে যেতেই পথের পাশে পড়লো এক গির্জ্জে, ভিতরে চমৎকার অর্গ্যান বাজছে, গান হচ্ছে। বড় কালু ভাবলে, যাই, ভিতরে গিয়ে একটু বসি। জিরোনোও হবে, গান শোনাও হবে। এই ভেবে সে ছালাটা নামিয়ে রাখলো রাস্তার ধারে—ছোট কালু তো আর বেরোতে পারবে না—আর আশে-পাশের লোক সব তো গির্জ্জের মধ্যেই, কে তাকে খুলে দেবে!

বড় কালু তো ভিতরে গেলো, এদিকে ছোট কালু ছালার মধ্যে কেবলি ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—উঃ! উঃ! শরীর-টাকে মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে কত রকমই সে করলো, কিন্তু ছালার মুখটা একটু যদি ঢিলে হতো!

একটু পরে সে-পথ দিয়ে এলো এক বুড়ো গয়লা, এত বুড়ো যে তার চুল দাড়ি সব সাদা, হাতের মোটা লাঠিটায় ভর দিয়ে-দিয়ে সে মস্ত এক পাল গোরু-মোষ চালিয়ে নিচ্ছে। এখন হয়েছে কী, কয়েকটা গোরু ছালাটার উপর এমন হোঁচট খেলো যে ছালাটা গেলো উল্‌টিয়ে।

'ওঃ! ওঃ!' ছোট কালু দীর্ঘশ্বাস ফেললে। 'এই তো বয়েস আমার—এখনই কিনা আমাকে স্বর্গে যেতে হচ্ছে।'

গয়লা বলে উঠলো,—'আর আমি খুনখুনে থুত্থুরে বুড়ো,—এখন স্বর্গে উঠলেই বাঁচি।'

ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বললে ছোট কালু,—'চাও স্বর্গে যেতে? তাহ'লে এই ছালার মুখ খু'লে চট্‌পট্ ভিতরে ঢু'কে পড়ো—এক্কেবারে সোজা স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে।

'সত্যি? সত্যি?'—বুড়ো গয়লা তাড়াতাড়ি ছালার মুখ খুলে দিলে, বেরিয়ে এলো ছোট কালু। 'তাহ'লে আর দেরী কোরো না।'

বুড়ো গয়লা পলক না-ফেলতে ছালার মধ্যে ঢু'কে গেলো। ভিতর থেকে বললে, 'বড় উপকার করলে দাদা। তা আমার গোরু-মোষগুলোকে একটু দেখবে তো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে-জন্য ভেবো না,' ব'লে ছোট কালু ছালার মুখটা আগেকার মত শক্ত ক'রে বেঁধে গোরু-মোষের পাল নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়লো।

একটু পরেই বড় কালু গির্জ্জে থেকে বেড়িয়ে এসে ছালাটা আবার কাঁধে তু'লে নিলে। আর যেন মনে হ'লো ছালাটা আগের চাইতে একটু হালকা লাগছে—আসলে বুড়ো গয়লা তো ওজনে ছোট কালুর আদ্ধেক। কিন্তু বড় কালু ভাবলে গির্জ্জের গান-বাজনা শুনে তার মনে ফুর্ত্তি হয়েছে, সেইজন্যে ওজনটা অতটা টের পাচ্ছে না সে।

তবু তার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো। হাঁক দিয়ে বললে, 'ওহে, আছো তো ঠিক?'

বুড়ো গয়লা তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। স্বর্গে যাচ্ছি সোজা।'

হ্যাঁ স্বর্গেই যাচ্ছে

'হ্যাঁ। স্বর্গেইতো যাচ্ছো।' কথাটা শু'নে বুড়ো গয়লা বড় আরাম পেলো, এদিকে বড় কালুও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার পথ ধরলো।

মস্ত নদী— যেমন চওড়া তেমনি গভীর বড কালু পাড়ে দাঁড়িয়ে হেঁই-হো ক'রে ছালাটা জলের মধ্যে ফেলে দিলে—বুড়ো গয়-লা কে সুদ্ধু; তারপর ছোট কালুর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললে, 'কেমন এবার! আর চালাকি করবি আমার সঙ্গে!'

বাড়ী ফেরবার পথে একটা চৌরাস্তায় এসে বড় কালু দেখে ছোট কালু অন্য দিক থেকে আসছে এক পাল গরু-মোষ চালিয়ে।

'এ কী! এই না তোমাকে জলে ডুবিয়ে এলাম!'

'এই তো এইমাত্র জল থেকে উ'ঠে এলাম। আর বোলো না ভাই, যা উপকার করেছো!'

'এ-সব গোরু-মোষ কোত্থেকে জোটালে?'

'এরা সব জলের জন্তু। ভাগ্যিস্ আমাকে ডুবিয়েছিলে ভাই, তাই তো আমি এক লাফে গাছের ওপরে চ'ড়ে বসলুম। অ্যাদ্দিনে সত্যি আমি বড়লোক হলুম।'

ছোট কালু বললে, 'তাহ'লে সমস্তটাই শোনো। কী ভয়ই আমি পেয়েছিলুম—ছালার মধ্যে কুঁক্‌ড়ি-মুক্‌ড়ি হ'য়ে পড়ে'। আর তুমি যখন আমাকে হেঁই-য়ো ক'রে ছুঁড়ে ফেললে—বাস্‌রে সে কী বাতাসের শিষ! টুপ্ করে তো ডুবে গেলুম জলের নিচে, কিন্তু বলবো কী তোমায়, একটুও চোট লাগলো না আমার—নদীর নিচে সে কি চমৎকার নরম ঘাস। তার উপর যেই না পড়া, অমনি ছালার মুখ খুলে গেলো, আর অপরূপ এক কন্যা এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। ফুলের মত সাদা তার পোষাক, ভিজে চুলে তার সবুজ কুঁড়ির মালা। সে আমার হাত ধ'রে বললে, "ভাই ছোট কালু, সত্যি কি তুমি এসেছো? এখন এই গরু-মেষগুলোই নাও—এই রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক গেলে আরো অনেক দেখতে পাবে—সবই তোমার।" তখন আমি বুঝতে পারলুম যে নদীটা আসলে একটা রাস্তা—নদীর তলা দিয়ে জল-জন্তুরা সমুদ্র থেকে আসে, সোজা ডাঙা পর্য্যন্ত হেঁটে যায়। সেখানে কী সুন্দর সব ফুল আর লতা-পাতা। সে

তোমায় কী বলবো। মাছগুলো ঠিক আমার কানের কাছে দিয়ে সাঁৎরে চ'লে গেলো, আকাশে যেন পাখী উড়ছে।' আর কী সুন্দর মানুষ সেখানকার—আর কী সুন্দর সব গরু-মোষ সেই নরম ঘাসে মনের সুখে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে!'

'তাহ'লে আবার উঠে এলে কেন?' বড় কালু জিজ্ঞেস করলে, 'আমি হ'লে তো অত সুন্দর জায়গা থেকে আর নড়তুম না।'

ছোট কালু বললে, 'আহা, এটা বুঝলে না? এই তো বুদ্ধির প্যাঁচ। জলকন্যা আমাকে বললে তো—মাইলখানেক গেলে আরো অনেক গোরু-মোষ পাবে। এখন সেই নদীতে জানো তো—কত মোড়, কত প্যাঁচ, কত আকাবাঁকা—অনেক ঘু'রে যেতে হয়। সেইজন্যে আমি ভাবলুম, অত ঘুরে গিয়েই যদি এক মাইল, ডাঙা দিয়ে গেলে আধ মাইলের বেশি হ'তে পারে না। তাই আমি চলেছি—ঐ মাঠটা পার হ'য়ে আবার নদীতে গিয়ে নামবো—সেখানকার জলজন্তু সব তো আমার।'

'ভাগ্য বটে তোমার!' বড় কালু ব'লে উঠলো। 'আচ্ছা, আমি যদি জলের নিচে যাই, আমি কি কিছু জলজন্তু পাবো না?'

'তা পেতে পারো; কিন্তু আমি তোমায় ছালায় ভ'রে বয়ে নিতে পারবো না—তুমি যে বড্ড ভারি। তবে তুমি যদি নদীর ধারে গিয়ে ছালার মধ্যে ঢুকে পড়ো, তাহলে অবিশ্যি তোমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'বেশ ভাই, বেশ', বড় কালু খুসি হ'য়ে বললে,—'কিন্তু যদি

সেখানে কোনো জলজন্তু না পাই তাহলে উঠে এসে তোমাকে কিন্তু এমন মারবো—'

'না ভাই, খুব বেশী মেরো না',—ছোট কালু বললে।

দু'জনে একসঙ্গে গেলো নদীর ধারে। অনেকক্ষণ ধ'রে চলতে-চলতে গোরু-মোষগুলোর তেষ্টা পেয়েছিলো—জল দেখেই তারা ছু'টে নদীতে গিয়ে নামলো।

'ছাখো, ছাখো!' ছোট কালু বললে। 'নদীতে ফিরতে পারলে এরা বাঁচে।'

বড় কালু ধমক দিয়ে বললে, 'কই, আগে আমাকে ফ্যালো। নয় তো এমন মারবো—'

একটা মোষের পিঠে মস্ত একটা ছালা বিছানো ছিলো, সেটা নিয়ে এসে ছোট কালু বললে, 'এই যে, ঢু'কে পড়ো।'

তক্ষুনি ঢুকলো বড় কালু ছালার মধ্যে, ঢুকে বললে, 'একটা পাথর দিয়ে দাও—এমনিতে হয়-তো ডুববো না—কে জানে।'

'নিশ্চয়ই', ব'লে ছোট কালু খুব ভারি একটা পাথর ছালার মধ্যে দিয়ে মুখটা শক্ত ক'রে বাঁধলো, তারপর দিলে গায়ের জোরে এক ধাক্কা। ঝুপ্! বড় কালু গড়িয়ে পড়লো নদীতে, সঙ্গে-সঙ্গে ডুবে গেলো একেবারে তলায়।

ছোট কালু বললে,—'ও জলজন্তুদের খুঁজে পেলে হয়।' তারপর নিজের গোরু-মোষের পাল নিয়ে রওনা হ'লো বাড়ীর দিকে।

এক খোসায় পাঁচজন

এক ছিলো মটরশুঁটি।

এক মানে অবিশ্যি একজন নয়, কারণ আসলে তারা ছিলো পাঁচজন। এক হচ্ছে খোসাটা, আর পাঁচ হচ্ছে ভিতরে মটর-শুঁটি। খোসাটা সবুজ, তারাও সবুজ, তাই তারা ভাবতো সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি সবুজ—ভাবতেই পারতো! খোসাটা বাড়লো, তারাও বাড়লো—ফুট্‌ফুটে পাঁচজন এক সারে পাশাপাশি ব'সে। বাইরে রোদের আলো, খোসাটা তাতে গরম হয়; বাইরে বৃষ্টির জল, খোসাটা তাতে পরিষ্কার পাৎলা হ'য়ে আসে। ফুট্‌ফুটে দিনেও ভালো, থম্‌থমে রাতেও ভালো; দিনে-দিনে পাঁচজন তারা বড় হয়—আর যত বড় হয় ততই তাদের ভাবনা ধরে—কিছু করতে হবে তো।

'এখানেই চিরকাল ব'সে থাকবো নাকি আমরা?' একজন বললে। 'ব'সে থাকতে-থাকতে শক্ত হয়ে গেলেই গেছি। বাইরে কত জানি কী হচ্ছে—একটু-একটু টের পাচ্ছি যেন।'

মাস কেটে গেলো। হলদে হ'য়ে এলো তারা, হলদে হ'য়ে এলো খোসা।

'সমস্ত পৃথিবী হলদে হ'য়ে যাচ্ছে,' তারা বললে। বলতেই পারে!

হঠাৎ খোসায় এক টান! খোসাটা কে ছিঁড়ে নিলে, কার
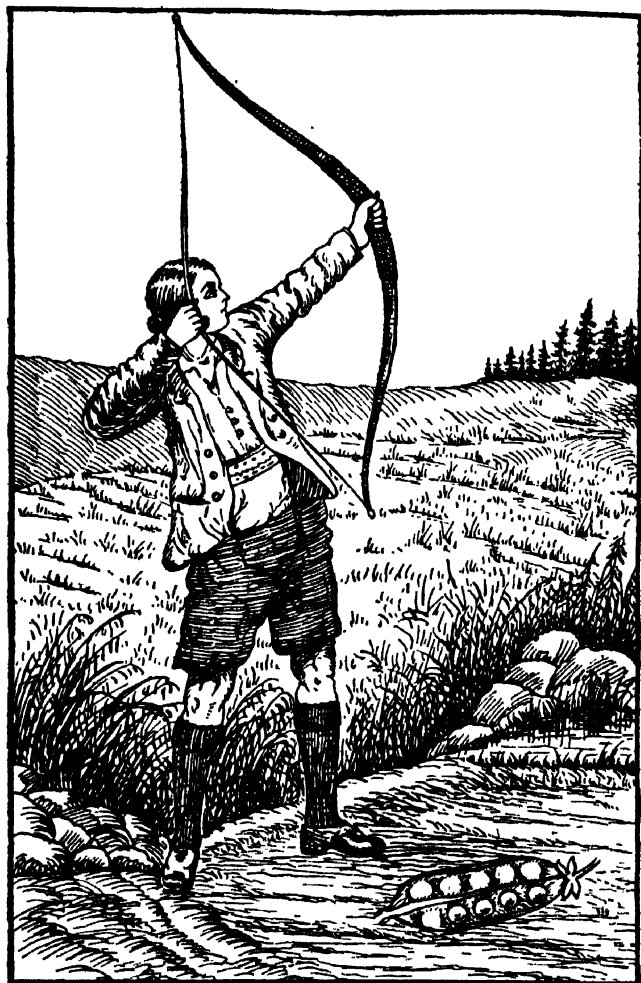
হাতের ভিতর দিয়ে চ'লে গেলো, টুপ্ ক'রে পড়লো একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোসার ঠেলাঠেলি ভিড়।

'এখন আমাদের খুলবে! খুব ফুর্তি হ'লো তাদের মনে—এতদিন তো এরই জন্যে তারা বসে ছিলো।

পাঁচজনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট যে, সে বললে, 'দেখা যাক্ আমাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরে কে যায়।' যিনি সব চেয়ে বড়, তিনি শুধু বললেন, 'যা' হবার তা-ই হবে।'

ঠাস্! ফাটলো খোসা, পাঁচজন গড়িয়ে বেরিয়ে এলো ঝক্‌মকে রোদে। ছোট্ট নরম একটি হাতে তারা শুয়ে। ছোট্ট একটি ছেলে হাতের মুঠোয় তাদের ধ'রে আছে।

'বাঃ!' ছেলেটি ব'লে উঠলো। 'এগুলো দিয়ে আমার ধনুকের চমৎকার গুলি হবে।' এই না ব'লে একজনকে সে ধনুকের ছিলার উপর রাখলো, কাণে-কাণে টেনে দিলে ছুঁড়ে।

'চললুম আমি এই মস্ত পৃথিবীতে উড়ে। দ্যাখো আমাকে ধরতে পারো কিনা!' ব'লে সে চ'লে গেলো।

আর একজন বললে, আমি 'এক্কেবারে ঠিক সূর্য্যের বুকের মধ্যে গিয়ে লাগবো। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা—' ব'লে সে মিলিয়ে গেলো।

'যেখানেই গিয়ে আমরা পড়ি না, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেবো। তারপর গড়াবো মনের সুখে,' বললে এর পরেই দু'জন। গড়ালো বটে তারা, পেট ভ'রে গড়িয়ে নিলে ছিলাতে লাগাবার আগেই; কিন্তু ছেলেটি তাদের তু'লে নিয়ে আবার ছুঁড়ে

মারলে। যেতে-যেতে তারা বললে, 'আমরা যাবো সব চেয়ে দূরে।'

'যা হবার তা-ই হবে,' বললে শেষের জন। ধনুক থেকে বেরিয়ে সে ছুটলো, ছুটে গিয়ে লাগলো একটা কুঁড়েঘরের জানালার কপাটে।

এখন হয়েছে কী, সেই কপাটে ছিলো একটা ফুটো, আর সেই ফুটো নরম কাদা আর ঘাস দিয়ে আটকানো। এত জোরে ছু'টে এসে সে একেবারে আটকে গেলো সেখানটায়—না পারে নড়তে, না পারে চড়তে। তবু সে মোটেও ঘাবড়ালে না, মনে-মনে বললে,—'যা হবার তা-ই হবে।'

ঘরের ভিতরে থাকে এক কাঠকুড়ুনি, বড় গরিব সে। বনে ঘু'রে-ঘু'রে সে কাঠ কুড়োয়, শুকনো পাতা কুড়োয় ; লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘু'রে বাসন মাজে, ইঁদারা থেকে জল তোলে। শরীরে তার যথেষ্ট শক্তি, কাজে তার ক্লান্তি নেই, তবু তার দুঃখ দূর হয় না। ঘরে আছে তার ছোট্ট মেয়ে, অসুখে ভুগে-ভুগে তার মরণ দশা। পুরো এক বছর সে আছে বিছানায় শুয়ে—তারপর এমন হয়েছে যেন সে বাঁচবেও না, মরবেও না।

কাঠকুড়ুনি মনে-মনে ভাবে, 'ও বুঝি চললো ওর ছোট বোনটিরই কাছে। দুটি মাত্র মেয়ে ছিলো আমার—তাদের খাওয়ানো পরানো কম কষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই একজনের ব্যবস্থা করলেন, টেনে নিলেন তাঁর কোলে। আর-একজনাকে

আমি তো চাই আমার কাছেই রাখতে, কিন্তু ওরা দু'বোন বুঝি আর আলাদা থাকবে না!'

কিন্তু কই, মরলো না তো মেয়ে!

সমস্ত দিন চুপ ক'রে সে বিছানায় শুয়ে থাকে—আর তার মা ঘোরে বাইরে-বাইরে, কাঠ কুড়োয়, পাতা কুড়োয়, জল তোলে, বাসন মাজে। তখন বসন্তকাল, ভোরবেলায় তার মা যখন কাজে বেরিয়ে যায়, রোদের সোনালি রেখা জানলা দিয়ে মেঝেতে এসে পড়ে—মেয়েটি জানলার দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

'জানালার কপাটে ঐ ছোট্ট সবুজ ওটা কী, মা? হাওয়ায় নড়ছে?'

মা জানলার ধারে এগিয়ে দেখলে। 'আরে তাই তো! ছোট্ট একটা মটরশুঁটি যে, এখানেই শিকড় গজিয়েছে, পাতাও গজিয়েছে দু' একটা। এই ফাটলের মধ্যে কী ক'রে ও এলো? এই তো তোমার ছোট্ট বাগান, খুকুমণি, ব'সে-ব'সে তাকিয়ে দ্যাখো।'

ব'লে মা খুকুর বিছানা জানলার আরো কাছে টেনে আনলে। মা কাজে বেরিয়ে যায়, আর খুকু শুয়ে-শুয়ে দ্যাখে মটরশুঁটিটা কেমন সুন্দর বেড়ে উঠছে আস্তে-আস্তে!

একদিন সন্ধ্যেবেলায় খুকু বললে, 'মা, আমার মনে হচ্ছে আমি ভালো হ'য়ে উঠবো। আজকের রোদটা বড় সুন্দর লাগলো। আর দেখেছো ঐ মটরশুঁটির কাণ্ড—কী চমৎকার

বাড়ছে। আমিও অমনি হবো, মা, আমিও ভালো হ'য়ে উঠবো, বাইরে বেড়াবো এই স্থন্দর রদ্দুরে।'

'তা-ই যেন হয়, বাছা, তা-ই যেন হয়!'

মা ও-কথা বললে বটে, কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে খুকু তার বাঁচবে না। তবু সে কপাটের সঙ্গে একটা কাঠি বেঁধে দিলে—বাড়ন্ত সবুজ ডগাটুকু বেয়ে উঠতে পারবে। ও যেন হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে না পড়ে—ওকে দেখেই তো খুকু ভাবতে শিখেছে সে বাঁচবে।

কী আশ্চর্য্য! ছোট্ট সবুজ সেই ডগাটুকু সত্যি-সত্যি কাঠি বেয়ে উঠলো, উঠলো উপরে, ঠেলে উঠলো নতুন প্রাণের আনন্দে, রোজ সে একটু-একটু ক'রে বাড়ছে।

'আরে, ফুলও ফুটেছে যে একটা,' কাঠকুড়নি হঠাৎ একদিন ব'লে উঠলো। তখন থেকে তার মনে আশা হ'লো যে খুকু সত্যি-সত্যি হয়-তো ভালো হ'য়ে উঠবে। ক'দিন থেকে খুকু বেশ ভালোই আছে তো। দিব্যি কথা-বার্ত্তা বলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুসি। কাল একবার উঠেও বসেছিলো, ব'সে-ব'সে তার ছোট্ট বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, সে-বাগানে একটিমাত্র ছোট্ট চারাগাছ।

কয়েকদিন পরেই খুকু দস্তুরমত এক ঘণ্টা উ'ঠে ব'সে রইলো। বড় ভালো লাগলো তার রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে থাকতে। জানলায় ফুটেছে বেগ্নি রঙের মটরশুঁটির ফুল।

খুকু মুখ বাড়িয়ে কচি-কচি নরম পাতাগুলোকে একবার চুমু খেলো। দিনটি লাগলো উৎসবের মত।

মা আর খুসি চাপতে না-পেরে বলে উঠলে, 'স্বর্গের দেবতাই এই মটরশুঁটিকে পাঠিয়েছেন আমার ঘরে, তিনিই ফুটিয়েছেন এই ফুল। তুই খুসি হবি ব'লে—আর তোর খুসিতে আমিও খুসি হবো', ব'লে সে হাসলো বেগ্‌নি রঙের ফুলের দিকে তাকিয়ে, যেন সে-ফুল স্বর্গের কোনো দেবদূত।

কিন্তু আর চারজন? তাদের খবর কী? শোন তবে। যে মস্ত পৃথিবীতে উড়ে চ'লে গিয়ে বলেছিলো, 'দ্যাখো আমাকে ধরতে পারো কিনা!' সে গিয়ে পড়লো এক বাড়ীর ছাতে, সেখানে পায়রাদের দানা শুকোতে দেয়া হয়েছিলো, পড়বি তো পড়্ তারই মধ্যে। তারপর—খুট্! খুট্! আর তারপর পায়রার পেট। যে-দু'জন কুঁড়েমি ক'রে ঘুমোতে চেয়েছিলো তাদেরও পায়রা খেয়ে ফেললে—তবু যা হোক্ একটা কাজে লাগলো। কিন্তু তার পরের জন, যে চেয়েছিলো সূর্য্যে গিয়ে লাগতে—সে পড়লো একটা নরদমায়: একমাস, দু'মাস, তিনমাস শুয়ে রইলো সেই নোঙরা জলে—আর বেজায় ফুলতে লাগলো।

'কী সুন্দর মোটা হচ্ছি, আমি!' মনে-মনে সে বললে। 'শেষটায় একদিন ফেটেই যাবো—কিন্তু মটরশুঁটির পক্ষে তো এই ফেটে-যাওয়াই সব চেয়ে বড় গৌরব। পাঁচজনের মধ্যে আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।'

নরদমা বললে,—'ঠিক, কথা।'

এদিকে কুঁড়েঘরের জানলায় ছোট মেয়েটি দাড়িয়ে, চোখে তার আলো, গালে তার স্বাস্থ্যের লাল আভা। পাৎলা দু'হাত দিয়ে মটরশুঁটি ফুলকে আদর করছে সে।

'দেবতার অনেক দয়া, তুই ফুটেছিলি', বললে সে মেয়েটি।

'শ্রেষ্ঠ মটরশুঁটি, তুমি যে, আমারই!' নরদমা বললে।

মহম্মদ মহসীন্

মহম্মদ মহসীন্

সেদিন তাহাদের মা তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিতে পারেন নাই। খোঁজ খবর লইয়া মহসিন্ তাহাদের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি তখনই খাদ্যদ্রব্য কিনিবার জন্য তাহাদের কিছু টাকা দিয়া আসিলেন। পরের দিন সকালবেলা মহসিনের বাড়ীর চাকর প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া তাহাদের বাড়ী উপস্থিত হইল। মহামতি মহসিন্ তাহাদের দুঃখ দূর করিলেন। সেই সময় হইতে তাহাদের আর অনাহারে দিন কাটাইতে হয় নাই।

অনুশীলনী

১। মহসিন্ রাত্রে বেড়াইতে বেড়াইতে কি দেখিয়াছিলেন ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

মহসিন্ অপরের দুঃখ — করিবার চেষ্টা কবিতেন।

তিনি অতি — ভাবে জীবন যাপন করিতেন।